বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ
(Reforms of Election System of the Bangladesh *Jatiya Sangsad*: An Analysis)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত

গবেষক:
মুহাম্মদ জহিরুল আলম
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৩৪/২০১৮-২০১৯
পুন: রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ০৩/২০২৩-২০২৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক:
ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ২০২৫

ঘোষণাপত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ (Reforms of Election System of the Bangladesh *Jatiya Sangsad*: An Analysis)** শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণার অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করা হলো। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন, যিনি এ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে আন্তরিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান করেছেন। এটি আমার নিজস্ব রচনা। এ অভিসন্দর্ভ বা এর অংশবিশেষ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

২৫/১২/২০২৫

মুহাম্মদ জহিরুল আলম
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ৩৪/২০১৮-২০১৯
পুন: রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ: ০৩/২০২৩-২০২৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

মুহাম্মদ জহিরুল আলম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য দাখিলকৃত **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ (Reforms of Election System of the Bangladesh *Jatiya Sangsad*: An Analysis)** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। অভিসন্দর্ভটির পান্ডুলিপি আমি পাঠ করেছি এবং এর মৌলিকতা ও উৎকর্ষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছি। এটি এখন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

২৬/১২/২০২৫

ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন
তত্ত্বাবধায়ক
এবং
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা-মা

মুহাম্মদ আনোয়ারুল আলম
ও
জেবুন্নেছা আলম

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা কর্মটির সফল সমাপ্তিতে আমি প্রথমে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। যে কোন গবেষণা কর্মে একজন গবেষকের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থাকেন আরো অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। তাদের সহযোগিতার প্রতিদান দেয়া অসম্ভব। তারপরও কয়েকজনের অবদানের কথা উল্লেখ করে যতটুকু সম্ভব কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ নষ্ট করতে চাই না।

আমার মত একজন সাধারণের পক্ষে গবেষণা করা কখনো সম্ভব হতো না, যদি আমি এমন শিক্ষাগুরু না পেতাম। এই অসামান্য কাজটি আমার জন্য যিনি করেছেন তাঁর প্রতি আমি চির ঋণী, চির কৃতজ্ঞ। তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু ও আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন। যিনি প্রথম দিন থেকে শেষ পর্যন্ত গবেষণা কর্মটি পরিচালনার সার্বিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে কখনো ফিরিয়ে দেননি। যা আমার জন্য এক বড় প্রাপ্তি। এমন একজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি সত্যিই গর্বিত। আমি আবারও তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাছিমা খাতুন, যিনি আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক ড. মাহফুজ পারভেজ সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে।

Dhaka University Institutional Repository

এ গবেষণা কর্মটির সফল সমাপ্তিতে যিনি সর্বদা আমাকে পাশে থেকে সাহস দিয়েছেন, কিভাবে লিখতে হয় শিখিয়েছেন, তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক অধ্যাপক ড. কুদরত এ খোদা (মা.আ.)। তাঁর প্রতি রইল অসামান্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ আমার জীবনের পরম বন্ধু কাজী ফৌজিয়া লতিফ এর প্রতি। যার শ্রম, অনুপ্রেরণা ও দোয়া আমার জন্য ছিল। আমার দোয়া ও ভালোবাসা আমার আদরের সন্তান মুহাম্মদ গোলাম মাহদী ও মুহাম্মদ গোলাম মাওলার জন্য, যারা আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে ও আমাকে নিয়ে ভেবেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এবং লাইব্রেরির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কথা কখনো ভুলবার নয়। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

সময়ের স্বল্পতার কারণে অনেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করতে পারিনি। তবুও যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবার প্রতি রইলো আমার কৃতজ্ঞতা।

মুহাম্মদ জহিরুল আলম
পিএইচ.ডি. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টির সর্বত্র প্রকৃতির নিয়মে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। কোথাও কোন নিয়ম ভঙ্গ হয় না। কিন্তু মানুষের স্বেচ্ছাচার প্রকৃতির মধ্যে বিরাজমান শান্তিকে বিঘ্নিত করে। তাই সুন্দর ও শান্তিময় সমাজ নিশ্চিত করার জন্য যুগে যুগে নানা মতবাদ তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো গণতন্ত্র। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হচ্ছে নির্বাচন। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক স্বচ্ছ কর্মকান্ড প্রয়োজন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নির্বাচন এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবস্থাই বারবার প্রশ্নবিদ্ধ ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতিটি জাতীয় বা গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতার প্রশ্নে সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়নি। নির্বাচন ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতি তুলে ধরে, পরাজিত পক্ষ নির্বাচন ও নির্বাচিত সরকারকে মেনে নিতে খুব কমই সম্মত হয়। ফলে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন, প্রশ্নবিদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করেছে এবং এ কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ নানা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক দল এবং সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ় ভিত্তির জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার সমস্যা ও সংকট দূরীকরণের মাধ্যমে সংস্কার সাধন করার উপর জোড় দিয়ে আন্দোলন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি উঠেছে। সংস্কারের লক্ষ্য হবে নির্বাচন ব্যবস্থাকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করা। এর উপর ভিত্তি করেই "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণা কর্ম।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চর্চায় প্রধান সমস্যা হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকতা। ফলে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক সংকট। তাই অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন ব্যবস্থা 'সংস্কার'-এর দাবি এসেছে। গবেষণা কর্মটিতে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশধারা, বিদ্যমান সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন এবং আইনি কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য হলো- বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১-২০১৪) সমূহের ত্রুটি ও সমস্যা সমূহ বিশ্লেষণ করা; বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রশ্নে রাজনৈতিক দল সমূহের প্রস্তাব, দাবি ও তৎপরতা তুলে ধরা; অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার জন্যে কি ধরনের সংস্কার আনা প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করা এবং গবেষণা কর্মটিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাপ্ত প্রস্তাবকে বিশ্লেষণ করা।

এ গবেষণায় ডেভিড ইস্টনের সিস্টেম থিওরি অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, আইনি কাঠামো, নির্বাচনের সমস্যাবলী, জনগণের প্রত্যাশা বিশ্লেষণ করে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি নিয়ে ইনপুট কাঠামো। রাজনৈতিক ব্যবস্থা, সংকট ও বিপর্যয় মোকাবেলায় দাবি মেটাতে চেষ্টা করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর দাবির চাপ যখন আসে, তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যা হলো আউটপুট। গবেষণায় তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রশ্নমালা ও মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (Key Informant Interviews-KIIs)। তথ্যের উৎস হলো- প্রাথমিক তথ্য এবং মাধ্যমিক তথ্য। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার ১০০ জনের উপর জরিপের পাশাপাশি কয়েকজন ব্যাক্তিত্বের স্বাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণা কর্মে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের নির্বাচন পদ্ধতির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। কারণ ঐ সকল দেশেও নির্বাচন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য আমাদের দেশের মতো একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং এ অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রায় একই রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান। দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশই নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে।

স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলোতে দুর্নীতির চর্চা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পরবর্তীতে এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে, জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নির্বাচনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুর্নীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় নির্বাচন চূড়ান্ত প্রহসনে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে দুর্নীতি, কারচুপি ও সন্ত্রাস অব্যাহত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে সম্প্রতি এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে; টাকা, পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার বর্জিত অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান কল্পনায় পরিণত হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনেই যে পেশিশক্তি ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারের চর্চা হচ্ছে তার প্রতিফলন- নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রাক-নির্বাচনী, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতায় নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি। প্রতিটি নির্বাচনেই দেখা যায় টাকার ছড়াছড়ি, সামরিক-বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য, উত্তরাকিার সূত্রে পাওয়া নেতৃত্ব ও মনোনয়ন, দলছুট প্রবণতা ও ডিগবাজি নেতৃত্ব, আদর্শিক দোদুল্যমানতা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব, নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ, রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ, রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ ভূমিকা। যা বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত করেছে। নির্বাচন ব্যবস্থায় 'সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি' এবং 'আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি', নিয়েও শুরু হয়েছে বিতর্ক। জরিপের ফলাফলসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১০০জন উত্তরদাতার মাঝে ৮৬% মনে করেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় না। ৯৩% উত্তরদাতা মনে করেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা যথাযথ নয়। তাদের মধ্যে ৬২% মনে করেন নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কার হলে নির্বাচনে জনগণের আস্থা ফিরবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হবে। সংস্কার আমরা লক্ষ্য করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তীতে ২০০৬-২০০৮ সালের দিকে সংস্কার ব্যাপকতা লাভ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হতেও সংস্কারের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে। সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকেও আসছে নানা প্রস্তাব। আদর্শ ও নীতিভিত্তিক দলগঠন নিশ্চিত করতে হবে, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে হবে, নির্বাচনে দলের প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হতে হবে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার করতে হবে, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার হতে হবে, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হবে, নির্বাচনী আইন ও বিধির সংস্কার হবে, নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর ভূমিকা নিরপেক্ষ হবে, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এর লক্ষ্যে সবার সমান সুযোগ করে দিতে হবে, প্রাক-নির্বাচনী, নির্বাচনকালীন ও নির্বাচন পরবর্তী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা থাকতে হবে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার মানে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করা। আলোচ্য গবেষণায় দেখা যায় নির্বাচন কমিশনের কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন হলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয় না। ক্ষমতাসীন দল নির্বাচন কমিশন গঠনে ও কার্যক্রমে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরকে বিশ্বাস করে না। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক ঐক্যমতের যথেষ্ট অভাব। বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থার সংকট রয়েছে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার হলে নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হবে। জনমনে আস্থা ফিরে আসবে। দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা বাড়বে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরো অধিকতর শক্তিশালী হবে। নির্বাচন ব্যবস্থার কাঠামোগত ও আইনগত সংস্কার হলে নির্বাচন কমিশন আরো অনেক শক্তিশালী হবে, ফলে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী বিধি মেনে নিয়ন্ত্রিত আচরণ করবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহের মধ্যে যেসব ত্রুটি, অনিয়ম ও রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট যে, বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও আস্থার ঘাটতি রয়েছে। ফলে সমাজের সকল স্তর থেকেই নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারকে স্বাগত জানিয়েছে।

একটি আধুনিক, সমৃদ্ধশালী ও শান্তিময় বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা হৃদয়ে লালন করি। এ জন্য প্রয়োজন সুন্দর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি। নির্বাচন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বৈধতা দান করে। নির্বাচন যথার্থ না হলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থাৎ নিজ মতের প্রতিফলন ঘটে না। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার এখন সময়ের দাবি। সংস্কার হতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার অপরিহার্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণির তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
২.১	১৯২৩ সালের নির্বাচনের ফলাফল	৪০
২.২	১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনের ফলাফল	৪১
২.৩	১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনের ফলাফল	৪২
২.৪	প্রদেশ ওয়ারী আইন সভার সংগঠন, ১৯৪৭-৫৪	৪৪
২.৫	১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	৪৭
২.৬	পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	৫১
২.৭	পশ্চিম পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল	৫২
২.৮	দক্ষিণ এশিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক পদ্ধতিতে গঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভাসমূহ	৭৮
২.৯	দক্ষিণ এশিয়ায় পিআর ভিত্তিক পদ্ধতিতে গঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভাসমূহ	৭৮
২.১০	দক্ষিণ এশিয়ায় মিশ্র পদ্ধতিতে গঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভাসমূহ	৭৯
৩.১	জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৭৩	৮৫
৩.২	জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ১৯৭৯	৮৭
৩.৩	জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ১৯৮৬	৮৯
৩.৪	জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ১৯৮৮	৯১
৪.১	২০০৮ সালের নির্বাচনের ফলাফল	১১১
৪.২	২০১৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল	১১৩
৬.১	জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইন	১৪৯
৬.২	নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল সমূহ	১৫৯

Dhaka University Institutional Repository

টেবিলের তালিকা

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা নং
৭.১	উত্তরদাতাদের বয়সসীমা	২১৩
৭.২	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়	২১৪
৭.৩	বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা যথাযথ	২১৫
৭.৪	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার যে দিকটি সবচেয়ে বেশী সংস্কারের প্রয়োজন	২১৬
৭.৫	নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ রয়েছে	২১৭
৭.৬	নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্বাসের মাত্রা কতটা	২১৮
৭.৭	সুষ্ঠু নির্বাচনে প্রার্থীদের আর্থিক স্বচ্ছতার বিষয়টির গুরুত্ব	২১৯
৭.৮	নির্বাচনে অবৈধ অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য	২২০
৭.৯	নির্বাচনে পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার	২২১
৭.১০	রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কতটা স্বচ্ছ	২২২
৭.১১	নির্বাচনী দুর্নীতির প্রভাব কোথায় পড়ে	২২৩
৭.১২	নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন করা উচিত	২২৪
৭.১৩	ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটদানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে যে বিষয়টি জরুরী	২২৫
৭.১৪	আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হবে	২২৬
৭.১৫	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন	২২৭
৭.১৬	নির্বাচনী সংস্কারের জন্য সবচেয়ে জরুরী পদক্ষেপ	২২৮
৭.১৭	নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য যে ধরনের সংস্কার প্রয়োজন	২২৯
৭.১৮	নির্বাচনী আইন লংঘনের জন্য শাস্তির বিধান কি থাকা উচিত	২৩০
৭.১৯	বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় নারী ও সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণের সুযোগ যথেষ্ট	২৩১
৭.২০	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং (EVM) ব্যবহার	২৩২
৭.২১	নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ করা যেতে পারে	২৩৩

শব্দ সংক্ষেপ

UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Programme
NID	National Identity Card
FEMA	Fair Election Monitoring Alliance
TIB	Transparency Interantional Bangladesh
CPD	Centre for Policy Dialogue
RPO	Representation of the People Order
EU	European Union
AL	Awami League
FPTP	First Past The Post
PR	Proportional Representation
বিএনপি	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
সিপিবি	কমিউনিষ্ট পার্টি অব বাংলাদেশ
এমএল	মুসলিম লীগ
জাসদ	জতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
ন্যাপ	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি
পিপিপি	পাকিস্তান পিপল্স পার্টি
এনডিএফ	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট
ই সি	ইলেকশন কমিশন

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় বিন্যাস

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ
(Reforms of Election System of the Bangladesh *Jatiya Sangsad*: An Analysis)

অধ্যায়	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায় ভূমিকা ১.১ ভূমিকা ১.২ গবেষণার যথার্থতা ১.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয়তা ১.৪ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১.৫ গবেষণা পদ্ধতি ১.৬ তাত্ত্বিক কাঠামো ১.৭ তথ্য সংগ্রহ ১.৮ পুস্তক পর্যালোচনা ১.৯ অনুকল্প গঠন ১.১০ গবেষণা প্রশ্ন ১.১১ সংস্কারের অভাবে নির্বাচনে বিরূপ প্রভাব পড়ে ১.১২ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ১.১৩ সীমাবদ্ধতা ১.১৪ অধ্যায় বিন্যাস ১.১৫ তথ্যপুঞ্জী	১-২৯

দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা ২.১ নির্বাচন ২.২ নির্বাচন পদ্ধতি ২.৩ বঙ্গীয় আইন সভার বিকাশ ২.৪ পাকিস্তান আমল ঃ নির্বাচন ব্যবস্থার সন্ধানে ২.৫ বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতি ২.৬ বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ২.৭ নির্বাচন পদ্ধতির জন্য আইনি কাঠামো ২.৮ ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকার নির্বাচন পদ্ধতি ও তুলনামূলক পর্যালোচনা ২.৯ তথ্যপুঞ্জি	৩০-৮২
তৃতীয় অধ্যায় স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭২-১৯৯০) ৩.১ সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৩ ৩.২ সংসদ নির্বাচন : ১৯৭৯ ৩.৩ সংসদ নির্বাচন : ১৯৮৬ ৩.৪ সংসদ নির্বাচন : ১৯৮৮ ৩.৫ তথ্যপুঞ্জি	৮৩-৯৩

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১-২০১৪) ৪.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৪.২ তিন জোটের রূপরেখা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৪.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ১৯৯১ এর নির্বাচন ৪.৪ সাংবিধানিক প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন : ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ও ১২ জুন ১৯৯৬ এর নির্বাচন ৪.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ২০০১ সালের নির্বাচন ৪.৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৬-২০০৮ ৪.৭ ২০০৮ সালের নিবার্চন ৪.৮ ২০১৪ সালের নিবার্চন ৪.৯ তথ্যপুঞ্জী	৯৪-১১৬
পঞ্চম অধ্যায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সমস্যাবলী ৫.১ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুর্নীতির স্বরূপ ৫.২ নির্বাচন মানেই টাকার ছড়াছড়ি ৫.৩ সামরিক -বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য ৫.৪ দলছুট প্রবণতা ও ডিগবাজি নেতৃত্ব ৫.৫ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নেতৃত্ব ৫.৬ আদর্শিক দোদুল্যমানতা ৫.৭ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব	১১৭-১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৫.৮ রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ ৫.৯ রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ ভূমিকা ৫.১০ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন অনিয়ম ৫.১১ তথ্যপুঞ্জী	
ষষ্ঠ অধ্যায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ৬.১ গণতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থার গুরুত্ব ৬.২ নিরক্ষেপ নির্বাচন ৬.৩ নির্বাচনী সংস্কার ৬.৪ সংস্কার আন্দোলন ৬.৫ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার প্রসঙ্গে এফপিটিপি ও পিআর পদ্ধতি ৬.৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইন ৬.৭ সংস্কার প্রস্তাব ৬.৮ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ৬.৮.১ রাজনৈতিক দল ৬.৮.২ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দল ৬.৮.৩ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ৬.৮.৪ বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ৬.৯ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা ৬.৯.১ সিভিল সোসাইটি ৬.৯.২ বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটি ৬.৯.৩ বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া জোরদারে সিভিল সোসাইটি	১৩৭-২১০

Dhaka University Institutional Repository

৬.৯.৪ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে সিভিল সোসাইটি ৬.১০ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে উন্নয়ন সহযোগীদের অবস্থান ৬.১১ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন' প্রদত্ত প্রস্তাব ৬.১২ নির্বাচনী সংস্কারে নারী প্রসঙ্গ ৬.১৩ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে পরিচালিত আন্দোলন তৎপরতা ৬.১৪ তথ্যপুঞ্জী	
সপ্তম অধ্যায় **তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ**	২১১-২৩৫
অষ্টম অধ্যায় **উপসংহার**	২৩৬-২৪৪
সহায়ক গ্রন্থাবলী	২৪৫-২৫৪
পরিশিষ্ট	২৫৫-২৬২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ ভূমিকা ঃ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য ও মৌলিক শর্ত হল নির্বাচন। কিন্তু গণতন্ত্রের সঠিক কার্যকারিতা ও স্থায়িত্বের জন্য চাই যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচন। বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন, দেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিরই একটি অংশ। কিন্তু অধিকাংশ নির্বাচনই বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বারোটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবগুলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে তা বলা যায় না। সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি উঠেছে। সংস্কারের লক্ষ্য হবে নির্বাচনকে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করা। নির্বাচন, বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমাদের দেশে সংকট দেখা দেয়। শুরু হয় নির্বাচন বর্জন ও প্রতিরোধের ঘোষণা, যা আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বে বেমানান। ফলে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে স্থবির হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির মাঝে সংকট সমাধানের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। জনগণও নির্বাচন নিয়ে আর সংঘাত চায় না। এর উপর ভিত্তি করেই "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণা কর্ম। আশা করি আলোচ্য গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে।

সভ্যতার বিকাশ, রাষ্ট্রগঠন ও সরকার ব্যবস্থাপনায় আজ পর্যন্ত যতগুলো রাজনৈতিক মতবাদ মানবজাতিকে নাড়া দিয়েছে, গণতন্ত্র তার মধ্যে অন্যতম এবং এর আবেদন চিরন্তন। এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণ হচ্ছে নির্বাচন। কারণ গণতন্ত্রে সরকারের কর্তৃত্বের উৎসই হচ্ছে শাসিতের সম্মতি। আর অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমেই

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের প্রতি জনগণের সম্মতি প্রতিফলিত হয়। সকল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সকল নির্বাচনই গণতান্ত্রিক নয়। যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্রের কার্যকারিতা থাকে না। তাই গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন একটি অপরিহার্য বিষয়। সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যও নির্বাচন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক স্বচ্ছ কর্মকান্ড প্রয়োজন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, নির্বাচন এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবস্থাই বারবার প্রশ্নবিদ্ধ ও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। ১৯৭৩ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রতিটি জাতীয় বা গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতার প্রশ্নে সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়নি। দুঃখজনক হলেও সত্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচনটিও প্রশ্নের ঊর্ধ্বে ছিল না।

> "One foreign journalist wrote, 'Sheikh Mujibur Rahman would have won handsomely even if the election had been conducted by the United Nations and supervised by the Red Cross.' But the legitimacy of the electoral mandate was compromised by some zealous Awami League workers who resorted to strong-arm methods and false ballots, in their desire to win all the seats. In some of the closely contested constituencies, the prospective opposition candidates were kidnapped by the AL workers before they could file their nomination papers. In several constituencies in Barisal, Tangail and Chittagong, where opposition candidates were leading during the voting, the counting of ballots was suddenly halted while the ballot boxes were stuffed with fake papers and AL candidates were declared elected under the watchful eyes of AL volunteers."[১]

বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থার নানা গলদকে তুলে ধরে, পরাজিত পক্ষ নির্বাচন ও নির্বাচিত সরকারকে মেনে নিতে খুব কমই সম্মত হয়। ফলে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন, প্রশ্নবিদ্ধ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করেছে এবং এ কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ নানা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। একইভাবে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক দল এবং সিভিল সোসাইটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক দৃঢ় ভিত্তির জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

ও সংকট দূরীকরণের মাধ্যমে সংস্কার সাধন করার উপর জোড় দিয়ে আন্দোলন তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

আজ যদি আমরা আমাদের যাত্রাপথকে বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাব রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, পরিকল্পনাহীনতা, দুর্নীতি এবং অর্থনৈতিক অধোগতি আমাদের অগ্রযাত্রাকে কিভাবে ব্যাহত করেছে। স্বাধীনতার পর কয়েক দশক অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও দেশে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হয়নি। এ জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী। এ গবেষণা কর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্বাচনকে আরো যুগোপযুগী ও গণমুখী করে তোলার জন্য যে সকল তৎপরতা তথা সংস্কার কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচনের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচন রাজনৈতিক দীক্ষা বা সামাজিকীকরণের উপায়। নির্বাচন পদ্ধতির প্রতি সমর্থন বা অসমর্থন করার সাথে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন বা অসমর্থন করার একটি গভীর যোগসূত্র রয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচন গণতান্ত্রিক ভাবধারার সমগামী।

> "In fact, under the present state system no meaningful relationship can be established between 'people' and 'rule'- two vital aspects of democracy- without elections. Only elections can materialize people's ruling power into practice. Elections facilitate the ordinary people to choose their preferable policies and policymakers, and these allow the political elites to compete for power. … Elections are treated as the most significant method of establishing as well as upholding democracy."[২]

নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার এখন সময়ের দাবি। বিষয়টি সকল রাজনৈতিক দল হতেও কমবেশি উচ্চারিত হয়েছে। দেশের ভোটার সমর্থকদের বৃহৎ অংশই এ সংস্কারের পক্ষে। দলীয় গঠনতন্ত্রের প্রয়োজনীয় রদ বদল, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, সদস্য সংখ্যার তালিকা ও দলের তহবিলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা দরকার। সংস্কারের উপর আগামী রাজনীতির গতিবিধি ও দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সমাজ উন্নয়ন ও রাষ্ট্রের

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশ ঘটিয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই রাষ্ট্রের পত্তন, বিকাশ ও স্থায়িত্ব। দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কার, সুষ্ঠু নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে অনেক আগে থেকেই সিভিল সোসাইটির সদস্যরা সরকার ও দেশবাসীর সামনে করণীয়গুলো তুলে ধরেছেন। তাদের মূল কথা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কিছু মৌলিক পদক্ষেপ সরকারকে নিতে হবে। আর এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে দেশের রাজনৈতিক শক্তি, নাগরিক সমাজ, ব্যবসায়ী সমাজ সবার সঙ্গে সরকার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং সবাই একযোগে কাজ করবে।

বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিতে 'সংস্কার' শব্দটি স্থান করে নিয়েছে। নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন পদ্ধতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার সর্বত্রই আলোচিত হয়। অনেক সচেতন নাগরিক ও নাগরিক সংগঠন এ ক্ষেত্রে সোচ্চার ভূমিকা রেখেছেন। "নির্বাচনী সংস্কার হচ্ছে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্ব শর্ত। এ বাবদে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক কর্মকান্ডে, ওপর-নিচ উভয় পর্যায়ের জনসাধারণকেই সম্পৃক্ত করতে হয়। কারণ, নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষকে নির্বাচন পরিচালনার জন্য অথবা এমন পদ্ধতি নির্ধারণের লক্ষ্যেই কাজ করতে হয়, যাতে ভোটাররা ভোট দিতে পারেন এবং প্রতিটি ভোট গণনার দ্বারা নির্বাচনের ফলাফল স্থির করা যায়। প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের দ্বারাও সমর্থিত হওয়া এবং তাঁদের সবার কাছেই সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিধিসম্মত গ্রহণযোগ্য প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হওয়া দরকার।"[৩] আমাদের রাজনীতিকে পরিচ্ছন্ন ও সুষ্ঠু ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হলে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কার আনতে হবে সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়। যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সৎ, যোগ্য, নিষ্ঠাবান রাজনীতিকদের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া; যা নিশ্চিত করবে সুশাসন, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র। এর কোনটিই একটি অপরটির সঙ্গে বিনিময়যোগ্য নয়। সুশাসন ব্যতিরেকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র যেমন থাকে না, আবার এর কোন একটির অনুপস্থিতিতে সুশাসন হয় না। তাই প্রধিনিধি নির্বাচন, উপযুক্ত সাংসদ নিয়ে গঠিত সংসদ, যোগ্য নেতৃত্বের প্রশাসন, দুর্নীতি মুক্ত

স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, অবাধ ও মুক্ত তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা ছাড়া উপায় নেই ।

বাংলাদেশের মতো দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রায় একই রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান। কিছু অমিল থাকলেও অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবাই গুরুত্ব প্রদান করে। তাই গবেষণা কর্মটিতে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পর্যালোচনা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিকে ইতিপূর্বে নানাভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণা কর্মটিতে বাংলাদেশের রাজনীতিকে পর্যবেক্ষণ করা হবে 'নির্বাচনী ব্যবস্থার' প্রেক্ষিতে। এখানে মূলত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর উপর ভিত্তি করে তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হবে। বর্তমান গবেষণা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ইতিবাচক প্রভাব রাখবে বলে বিশ্বাস রাখছি।

১.২ গবেষণার যথার্থতা ঃ

ধ্রুপদী ও আধুনিক উভয় দর্শনের অঙ্গনে নির্বাচনকে শুধুমাত্র ইতিবাচক হিসেবেই যে বর্ণনা করা হয়ে থাকে তা নয়। উভয় ক্ষেত্রেই নির্বাচনকে ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক মূল্যায়নের প্রয়াস রয়েছে। তাই নির্বাচন সংক্রান্ত গবেষণা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ভোট বা নির্বাচন আচরণের মধ্য দিয়ে জনমত, দলীয় কার্যক্রম, রাষ্ট্রীয় নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচরণসহ সর্বোপরি রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনের বিভিন্ন সূত্র প্রকাশ পায়। অপ্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির অনেক কৌতুহল উদ্দীপক উপাদান নির্বাচন সংক্রান্ত আচরণের সাথে সংযুক্ত। তাছাড়া সাধারণ মানুষের কাছেও বিষয়টি আগ্রহপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রায় সকল নির্বাচনই কোন না কোনভাবে সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা গবেষিত হয়ে আসছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মূলত পশ্চিমা ধাচের গণতন্ত্র কার্যকর রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এসব রাষ্ট্রগুলোতে সমাজের সকল স্তরে গণতন্ত্র কার্যকর রয়েছে এ কথা বলা যায় না। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হবার পর সেই নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলো যে আশা নিয়ে গণতন্ত্রকে বেছে নেয়, স্বাধীনতার অল্প সময়ের মধ্যেই তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখে পড়ে। ফলে সংস্কার সহ নানা কার্যক্রম আমরা লক্ষ্য করি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রসঙ্গটি চলে আসে। বাংলাদেশেও গণতান্ত্রিক রীতি নীতির চর্চা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের আন্দোলন তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়টি গবেষণায় চলে আসে।

১.৩ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয়তা ঃ

বাংলাদেশের মতো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচন একটি অপরিহার্য বিষয়। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাদের পছন্দানুযায়ী নেতা বা প্রতিনিধি বাছাই করে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য। বস্তুত ক্ষমতার বৈধকরণ ও হস্তান্তরের উপযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এই পদ্ধতির দ্বারাই সুসম্পন্ন হয়। ভোটে অংশগ্রহণের এ সুযোগ জনগণের অধিকার। "The right to participate in governmental decisions by casting a vote."[৪] নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ অন্য বিবেচনাতেও মূল্যায়নের দাবি রাখে। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ আত্মসচেতন, আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন হয়ে উঠার সুযোগ পায়। এর মাধ্যমেই তারা নিজেকে রাজনৈতিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মনে করে।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচন রাজনৈতিক দীক্ষা ও সামাজিকীকরণের উপায় এবং জাতীয় সংহতির সহায়ক। নির্বাচনের মাধ্যমে জাতি রাষ্ট্রের গঠনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অধিকতর তাগিদ অনুভব করতে পারে। প্রতিটি বিষয় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এখানে নির্বাচনের প্রসঙ্গটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা উন্নয়নশীল বিশ্বে নির্বাচনকে কখনও কখনও বৈধতার প্রশ্নে সংকটাপন্ন রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সংকট মুক্তির পথ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি এ সকল দেশে নির্বাচনকে আমলা ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপমুক্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারা বিকাশের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবেও মূল্যায়ন করা হয়। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের গণতন্ত্রের চাকা সচল রাখার জন্য অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি সকলের। ফলে সৃষ্টি হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ নানা ব্যবস্থার। ধীরে ধীরে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার প্রসঙ্গটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। দেশের ভোটার সমর্থকগণও সংস্কারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্যই এ রাষ্ট্রের জন্ম। এখানে যদি কোন সমস্যা আসে তবে তা সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করা প্রয়োজন এবং প্রত্যেকের প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। এ গবেষণা কর্মটিতে বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন এবং সংস্কার কার্যক্রমকে স্বার্থক করে তোলার জন্য নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকা, দাবি ও তৎপরতা তুলে ধরা হয়েছে। একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

১.৪ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

গবেষণা মাত্রই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে। একেকজন গবেষক একেকটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। গবেষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় নিয়ে বিশেষ অনুসন্ধান চালানো হয়। "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণা কর্মটিতে বাংলাদেশের বিদ্যমান সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির মনোভাব, কর্মতৎপরতা ও প্রস্তাবনা সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই প্রত্যাশা করি একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিটি সরকার দেশের সেবা করার দায়িত্বভার গ্রহণ করুক। আলোচ্য গবেষণাটি নিম্নলিখিত প্রধান উদ্দেশ্য সমূহকে বিশ্লেষণ করেছে -

ক. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার জন্যে কি ধরনের সংস্কার আনা প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করা;

খ. বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা;

গ. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১-২০১৪) সমূহের ত্রুটি ও সমস্যা সমূহ বিশ্লেষণ করা;

ঘ. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রশ্নে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রস্তাব, দাবি ও তৎপরতা তুলে ধরা;

ঙ. সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রস্তাবকে বিশ্লেষণ করা।

১.৫ গবেষণার পদ্ধতি ঃ

গবেষণা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন জ্ঞান, নতুন তথ্য এবং সত্যের সন্ধান লাভ করার প্রচেষ্টা, অর্থাৎ মানুষের আত্ম জিজ্ঞাসার একটি সুনিশ্চিত রূপ হচ্ছে গবেষণা।

এ গবেষণা কর্মটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে।
মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য পূর্বে যে গবেষণা হয়েছে সেসব উৎস, সংশ্লিষ্ট জার্নাল, প্রকাশিত বই, বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সরকারি নথিপত্র, দৈনিক পত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত সংবাদ এবং ইন্টারনেট থেকে তথ্যগুলো নেয়া হয়েছে।

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধ, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির চর্চা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এর জন্য সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন একটি গণ দাবি। ভোটার, সমর্থক, রজনৈতিক দল, সিভিল সোসাইটি অর্থৎ সব মহল হতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি এসেছে। যার ফলে আমরা জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের আন্দোলন ও তৎপরতা লক্ষ্য করি। গবেষণা কর্মটিতে মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে, বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ককেজন মূলধারার রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজের সদস্য, শিক্ষাবিদ, নির্বাচন কমিশনের সদস্য, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সদস্য সহ ভোটার, সমর্থকগণেন মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৬ তাত্ত্বিক কাঠামো ঃ

তাত্ত্বিক কাঠামো গবেষণার পথ প্রদর্শন করে। তত্ত্ব অভিজ্ঞতা লব্ধ পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। “বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ”

শীর্ষক গবেষণা কর্মটি ডেভিড ইষ্টনের সিস্টেম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। সিস্টেম তত্ত্বঃ

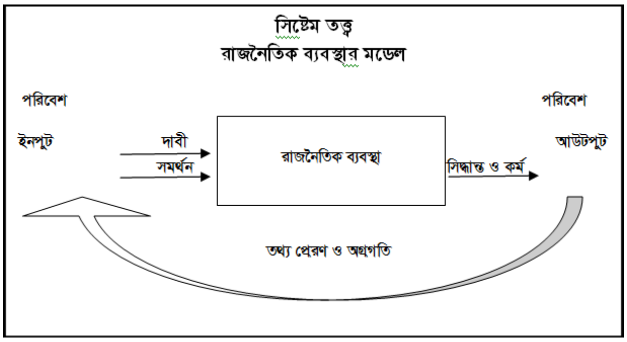

ইনপুট দাবিকে যুক্ত করে। আলোচ্য গবেষণায়, দাবি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবেশের নির্দেশক যা চাওয়া হচ্ছে, যা প্রয়োজন এবং যা অপরিহার্য। সাথে যুক্ত হয় সমর্থন যা সিষ্টেমের বৈধতাকে বিবেচনা করতে আগ্রহী। এর মাধ্যমে জনমত উঠে আসে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর দাবি এবং সমর্থন নিয়ে ইনপুট কাঠামো গঠিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংকট ও বিপর্যয় মোকাবেলায় দাবি মেটাতে চেষ্টা করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর দাবির চাপ যখন আসে, তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যা হলো আউটপুট।

১.৭ তথ্য সংগ্রহ ঃ

সামাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় মানুষের প্রতিক্রিয়ার ফলাফলই হচ্ছে উপাত্ত। প্রশ্নমালার প্রয়োগে মানুষের আচরণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করি তাই হচ্ছে উপাত্ত।

গবেষণার কাজে গৃহীত পরীক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা। সংগৃহীত তথ্যের নির্ভুলতা ও উৎকর্ষতার উপরই সিদ্ধান্তের মূল্যায়ন ও ফলাফলের সঠিকতা নির্ভর করে।

তথ্যের উৎসের ভিত্তিতে তথ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ঃ

প্রাথমিক তথ্য ঃ যে তথ্য মৌলিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে বা সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল উৎস হতে সংগ্রহ করা যায়, তাকে প্রাথমিক তথ্য বলে।

মাধ্যমিক তথ্য ঃ যে তথ্য পরোক্ষ উৎস হতে সংগ্রহ করা হয় বা কোন প্রকাশনা হতে সংগ্রহ করা হয় তাকে মাধ্যমিক তথ্য বা পরোক্ষ তথ্য বলে।

এ গবেষণা কর্মটিতে তথ্য সংগ্রহে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটিতে মূল তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারে, বিষয়ের উপর গভীর জ্ঞান সম্পন্ন কয়েকজন মূলধারার রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজের সদস্য, শিক্ষাবিদ, নির্বাচন কমিশনের সদস্য, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সদস্য সহ ভোটার, সমর্থকগণেন মতামত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালার আলোকে উত্তরদাতাগণের নিকট থেকে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে মতামত জরিপ পরিচালনা করে প্রাথমিক তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে পূর্বে যে গবেষণা হয়েছে সেসব উৎস, সংশ্লিষ্ট জার্নাল, প্রকাশিত বই, বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, সরকারি নথিপত্র, দৈনিক পত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারিত সংবাদ এবং ইন্টারনেট থেকে মাধ্যমিক তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৮ পুস্তক পর্যালোচনা ঃ

গবেষণা কর্মটির সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বাছাইকৃত গবেষণা কর্ম পর্যালোচনা করেছি-

ক. হোসেন, এম. সাখাওয়াত. (২০১৪). *বাংলাদেশে নির্বাচনী সংস্কার ১৯৭২-২০০৮*, চৌধুরী, রামেন্দ্র (অনুদিত). প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের উপর এটি একটি চমৎকার গবেষণা কর্ম। এখানে তিনি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বুঝাতে চেয়েছেন, সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। এছাড়া বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত সমস্যা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আঞ্চলিক দেশগুলোতে নির্বাচনী সংস্কারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। গবেষণা

কর্মটিতে একজন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে তিনি নির্বাচনী আইনের পর্যালোচনা, সংস্কার ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন।

এখানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে বিস্তৃত কোন আলোচনা হয়নি। কিভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর শক্তিশালী করা যায় তিনি তা ব্যাখ্যা করেননি। গ্রন্থে নির্বাচনী দুর্নীতিগুলো প্রাধান্য পায়নি।

খ. রহমান, এম. হাবিবুর. (২০১৩). *নির্বাচন যথেষ্ঠ নয়, তবে নির্বাচন হতে হবে.* শুদ্ধস্বর, ঢাকা।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সংবিধানে গণতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ গণতন্ত্র নির্বাচন ছাড়া শুধু অসম্ভব নয়, অকল্পনীয়। বাংলাদেশের সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনীর দ্বারা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান দেয়া হয়। সে বিধান পঞ্চদশ সংশোধনী দ্বারা রহিত করা হয়েছে। এখানে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোকে সহনশীল হতে বলেন, পাশাপাশি নির্বাচনে প্রদত্ত জনগণের রায় মাথা পেতে নেয়ার সংস্কৃতিতে আসতে বলেন। কিন্তু এখানে নির্বাচন কমিশনের সংস্কার, নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংস্কার, রাজনৈতিক দলের সংস্কার সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি।

গ. হোসেন, এস. আনোয়ার. (২০০৬). *বাংলাদেশ রাষ্ট্র, রাজনীতি, গণতন্ত্র ও সুশাসন*. একুশে বাংলা প্রকাশন, ঢাকা।

এখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধ, সংস্কৃতি, বাংলাদেশের সমসাময়িক সংকটাপন্ন রাজনীতি ও উৎকণ্ঠার ভবিষ্যৎ, ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি এবং সুষ্ঠু নির্বাচন ও কার্যকর নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করলেও নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে কোন আলোচনা করেননি। কিন্তু তিনি নির্বাচনে কালো টাকা, জাল ভোট ও পেশিশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

ঘ. ফ্রিডম্যান, মিল্টন. (২০০৩). *নির্বচনের স্বাধীনতাঃ একটি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা*. ফখরুদ্দিন, এ. ইউ. এম. (অনুদিত). বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

এ গ্রন্থে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামঞ্জস্যবিধান করা হয়েছে। এখানে আলোচনা করা হয়েছে, কিভাবে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিশেষ লক্ষ্যসমূহ সাধারন স্বার্থের উপর প্রভাব ফেলে। বর্তমান ব্যবস্থার ক্রুটি সংশোধনের ব্যাপারে তিনি আলোচনা করেছেন।

এখানে অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব প্রদান করলেও নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা করা হয় নি।

ঙ. মান্নান, আব্দুল. (২০০৫). *ইলেকশনস্ অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ*, একাডেমিক প্রেস অ্যান্ড পাবলিসার্স লাইব্রেরী, ঢাকা।

গ্রন্থটিতে গবেষক বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। অধ্যাপক মান্নান বাংলাদেশের বিরাজমান রাজনৈতি সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন। এখানে **১৯৯১** সালের পর থেকে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি নির্বাচন, নির্বাচনী ফলাফল, রাজনৈতি দলগুলোর প্রতিক্রিয়া, নির্বাচনী সন্ত্রাস ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু এখানে তিনি নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের ব্যাপারে কোন রূপরেখা প্রদান করেননি।

চ. হাসান, সোহরাব. (২০০৭). *নির্বাচন গণতন্ত্র মানবাধিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া*, দীপ্ত প্রকাশনী, ঢাকা।

নির্বাচন ও নির্বাচন উত্তর রাজনৈতিক সহিংসতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নিপীড়ন এ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সোহরাব হাসান তার বইয়ে রাজনৈতিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অভিঘাতে হাজার হাজার সংখ্যালঘু সদস্য যে নির্যাতনের শিকার হয়েছে তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি রাজনৈতিক সংস্কার, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। সোহরাব হাসান বলেন, সিভিল সোসাইটির যতটা জোরালো প্রতিবাদ করার কথা ছিল তা-তারা করতে পারেনি। অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তিনি বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন। আমার মতে তার বক্তব্য অত্যন্ত প্রসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত।

ছ. খান, মিজানুর রহমান. (২০০৩). *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ*. শুভ প্রকাশন, ঢাকা।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গ্রহণ কাল চলছে। এ সংকট সনাক্ত করা কঠিন। মিজানুর রহমান খান বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পর্যবেক্ষণ করেন এবং সংকটের মূল কারণ দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিকে মনে করেন। দলীয়করণ এদেশে নিওফ্যাসিজমের জন্ম দিয়েছে। তার মতে মুখ্য রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়া ও তাকে সমর্থন দেয়ার আড়ালে চাওয়া পাওয়ার বোধ ও ইচ্ছাটাই প্রবল।

নির্বাচন ব্যবস্থা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রভৃতিতে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের পারস্পরিক অনাস্থার প্রতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। যে সন্ত্রাস, দূর্নীতি, কালো টাকা ও অসুস্থ রাজনীতি নির্বাচনকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে গঠনমূলক চিন্তাভাবনা কম। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়ে আমাদের জাতীয় জীবনের বেশির ভাগ সংকট ও দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী প্রতিকূল ও বিরোধপূর্ণ রাজনিতিক আদেশ। তিনি বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতির নানা অসঙ্গতি তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি তিনি নির্বাচনী রাজনীতির কিছু শুভ পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিয়ে তা টিকিয়ে রাখার উপর জোর দেন।

আলোচ্য গ্রন্থে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ও নির্বাচনী আইনের সংস্কার নিয়ে কোন মতামত তুলে ধরেননি।

জ. মজুমদার, বদিউল আলম. (২০০৯). *গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন*. আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

নির্বাচন হলো সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, তবে নির্বাচন হতে হবে বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষায়, শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ [অনুচ্ছেদ-৫৮ (ঘ) (২)], একই সাথে নির্বাচন হতে হবে অর্থবহ, যার মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের গুনগত মানে পরিবর্তন আসবে। নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা করে। বদিউল আলম মজুমদার তার এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আমাদের গণতন্ত্র আজ চরম সংকটের মধ্যে নিপতিত। এর একটি বড় কারণ হলো, নির্বাচন প্রক্রিয়ার কলুষতা। তিনি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে আমাদের ক্রমবর্ধমান গণতান্ত্রিক সংকটের স্বরূপ ও ব্যাপকতা তুলে ধরেছেন, তিনি লক্ষ্য করেছেন কলুষিত নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ভয়াবহতা। গণতন্ত্রের সংকট অপসারণ, নির্বাচনকে পরিচ্ছন্ন এবং দুঃশাসনের জাঁতাকল থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া, নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলসহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের উপর জোর দিতে হবে। গ্রন্থে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার ও তার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যা আমার গবেষণা কর্মটির প্রতি আমার আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তার প্রস্তাবনা গুলো আমাদের রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয়।

এখানে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরলেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে বিস্তৃত কোন আলোচনা হয়নি। গ্রন্থে নির্বাচনী দুর্নীতি গুলো প্রধান্য পায়নি।

ঝ. আহমেদ, ফয়েজ. (২০০৮). *রাজনীতির গতিধারা*. অন্যান্য, ঢাকা।

কালের বিবর্তন ও রাজনৈতিক ব্যর্থতায় শাসনতন্ত্র আজ বিকৃত। সরকার একদিকে বৃহত্তর অঙ্গনে যে জাতীয় শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আছে, তার বাইরে অস্ত্রধারী শক্তি মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। এ অবস্থাকে ফয়েজ আহমেদ দ্বৈত শাসন

হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। যার পরিণতি ভয়াবহ। তিনি এ গ্রন্থে অনেক রাজনৈতিক প্রপঞ্চ তুলে ধরেছেন। সর্বত্রই রাজনৈতিক দ্বন্দ ফুঁটে উঠেছে। তিনি শাসনতন্ত্রে নারী অধিকারের নিশ্চয়তাও চান।

বাংলাদেশের রাজনীতির গতিধারা বিশ্লেষণ করে তিনি সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন। তার মতে দেশের রাজনৈতিক দুর্যোগ আরো বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা রয়েছে। সংসদ আজ অকেজো। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে সংসদকে রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত করতে হবে। এখানে পৃথকভাবে নির্বাচন ও এর সংস্কার নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি।

ঞ. উমর, বদরুদ্দীন. (২০০৯). *সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বাংলাদেশ*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

১৯৯০ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রথম গঠিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে সংকট আরো ঘনীভূত হয়। দেশের শীর্ষ দুটি দলের বিরোধ এবং অনাস্থার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি তিনি এখানে তুলে ধরেন। বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ এখানে গুরুত্ব পায়। ১/১১ হয় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা তিনি এখানে তুলে ধরেছেন।

তার আলোচনার মধ্যদিয়ে এদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতি উঠে এসেছে। যার কারণে জাতীয় জীবনে নানা সংকট সৃষ্টি হয়। নির্বাচন ব্যবস্থাকে ক্ষমতাসীন শক্তি প্রভাবিত করে। সংস্কৃতির বিকাশ না হওয়ায় নিম্ন সংস্কৃতির লোকদের রাজত্ব শুধু রাজনৈতিক দলগুলোতে স্থাপিত হয়েছে তা-ই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে নিম্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন একনায়করা নানা রাজনৈতিক চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্যদিয়ে নিজেদের অবস্থান অটুট রেখেছে।

ট. শফিক, মাহমুদ. (১৯৯৬). *জনগণ সংবিধান নির্বাচন*, অন্যান্য, ঢাকা।

বাংলাদেশের গণতন্ত্র রাজনৈতিক দল, ও নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে অত্যন্ত চমৎকার আলোচনা রয়েছে এ গ্রন্থে। মাহমুদ শফিক এদেশে গণতন্ত্র চর্চা ও যেসকল রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে তা তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে নির্বাচন ব্যবস্থার নানা দিক, ত্রুটি, বিচ্যুতি, নির্বাচনে সন্ত্রাস, কারচুপি তুলে ধরেছেন।

গ্রন্থে তিনি সংসদীয় নির্বাচনকে গুরুত্বসহকারে বিশ্লেষণ করেননি। নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে এখানে আলোচনা হয়নি।

ঠ. পাটওয়ারী, আয়াত আলী. (২০১০). *সাংবিধানিক সরকার বনাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার*. আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাংলাদেশের সংবিধানে একটি বড় ধরনের সংযোজন ছিল। তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সত্যিকার গণতন্ত্র ভাবাপন্ন সাংবিধানিক সরকার থাকলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যাওয়া কিংবা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে না যাওয়ার কোন প্রয়োজন পড়ত না। জনগণের সরকার দলীয় সরকারে যখন পরিণত হয়ে যায় তখনই প্রশ্ন ওঠে। আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা ও কাঠামো দলীয়করণ হলে সংস্কারের প্রয়োগ এসে যায়। লেখক সত্যিকার সহনশীল গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সহবস্থান, আচার-আচরণ এবং শিষ্ঠাচার এর প্রতি গুরুত্ব দেন। আলোচ্য গ্রন্থে রাজনৈতিক উন্নয়নের নানা দিক উঠে এসেছে।

এখানে তিনি নিরপেক্ষ নির্বাচন, নির্বাচনী সংস্কার, সংস্কার আন্দোলন, সংস্কার প্রস্তাব, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের কোন রূপরেখা উপস্থাপন করেননি।

ড. Karim, Waresul. (2004). *Election under a caretaker government - An empirical analysis of the October 2001 parliamentary election in Bangladesh*. The University Press.

গ্রন্থটিতে ১৯৯১ সাল হতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত তিনটি সংসদীয় নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক ২০০১ সালের নির্বাচনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এখানে সুষ্ঠু নির্বাচনের ধারণা, নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাসহ নির্বাচনের নানা দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। লেখক বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনের ইতিহাস, রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক উপস্থাপন করেছেন।

ঢ. হুদা, এটিএম শামসুল. (২০১৪). *ফিরে দেখা জীবন*, প্রথমা প্রকাশন।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে চলবে তার আনুষ্ঠানিক বিধিবিধান আছে। কিন্তু অন্তরালে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ, অনুরাগ-বিরাগও এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় বিশাল ভূমিকা রাখে। সাধারণ নাগরিকেরা এসবের কিছুই জানতে পারেন না। বাংলাদেশের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। গ্রন্থটিতে তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনে অতিবাহিত সময়কাল পর্যন্ত কিছু প্রতিষ্ঠানে পর্দার অন্তরালে সংঘটিত কিছু সত্য ঘটনা উপস্থাপন করেছেন।

ণ. তালুকদার, মাহবুব. (২০২৩). *নির্বাচননামা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

এখানে লেখকের নির্বাচন কমিশনের দিনগুলোর পেশাগত অভিজ্ঞতা সুন্দরভাবে ফুঁটে উঠেছে। তিনি উল্লেখ করেন- রাষ্ট্র, সরকার, সরকারি দল অনেক ক্ষেত্রে একাকার হয়ে গেছে। রাষ্ট্র থেকে সরকার এবং রাষ্ট্র ও সরকার থেকে রাজনৈতিক দল পৃথক থাকার গণতান্ত্রিক সৌন্দর্য এখন অনুপস্থিত। এসবই হচ্ছে গণতন্ত্রের সংকট। ভোট হচ্ছে স্বাধীন দেশে জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতীক, একটি পবিত্র আমানত। ভোটের মাধ্যমেই ভোটাররা তাঁদের প্রতিনিধি বেছে নেয়ার সুযোগ পান এবং এতে জনগণের আশা আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়। নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র অবলম্বন, যারা গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না,

তারা ভোটের উৎসবকে কলুষিত করতে চায়। আমরা যে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গহণযোগ্য ও আইনানুগ নির্বাচনের কথা বলি, ভোটের পবিত্রতা বিনষ্ঠ করে তা সম্ভব নয়। নির্বাচন ভূলুণ্ঠিত হলে গণতন্ত্রও ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়।

গ্রন্থটিতে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের সুস্পষ্ট প্রস্তাবনা থাকলে অরো ভালো হতো।

দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণা কর্ম ঃ

প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মটি শুরুর আগে আমি দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণা কর্ম পর্যালোচনা করেছি। কারন ঐ সকল দেশেও নির্বাচন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের জন্য আমাদের দেশের মত একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং এ অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রায় একই রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান। "তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর নির্বাচনী চর্চা ও সংস্কৃতি জরিপ করলে এসব দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নানা ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়ে। উল্লেখ্য, এ অঞ্চলের বেশির ভাগ দেশই দরিদ্র এবং গ্রামপ্রধান।[৫] দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশই নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটানে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন রয়েছে। রাজকীয় ভুটানে গণতহবিল আইন জারির মাধ্যমে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয় মেটাতে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্ধ করে। এ অঞ্চলে এটাই প্রথম। নেপাল প্রথমবারের মত মিশ্র পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করে। এ বিষয়টিও নতুন। প্রতিটি দেশেই রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন করা হয়। এ ক্ষেত্রে নেপাল অনেক অগ্রসর।

ক. Mendis, D. (Eds). (2008). Electoral process and governance in South Asia. SAGE, India.

এ গ্রন্থে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর নির্বাচনী ব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার, সফলতা ও ব্যর্থতা চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। গ্রন্থটিতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলংকার প্রেক্ষাপটে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রাধান্য পেয়েছে।

খ. Kumar, V. (2009). Electoral reforms in India: Current discourse. Rawat Publication, India.
ভারতের নির্বাচনী আইন ও সংস্কার এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত কিছু পদক্ষেপ যেমন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন এর ব্যবহার ও ভোটার পরিচয় পত্র আলোচিত হয়েছে। পাশাপাশি আরো কয়েকটি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা এখানে প্রধান্য পেয়েছে।

গ. Kaur, A. (2009). Electoral reforms in India : Problems and needs 1989-2009. Unistar Books, India.
পৃথিবীর বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের নির্বাচন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নির্বাচনের মাধ্যমেই সু-শাসন নিশ্চিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থে নির্বাচন ব্যবস্থার ত্রুটি, নির্বাচনী সংস্কার এবং এর প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ. Vundru, R. S. (2017). Ambedkar, Gandhi and Patel: The making of Indian's electoral system. Bloomsbury, India.
ঔপনিবেশিক ও স্বাধীন ভারতের নির্বাচনী ইতিহাসের প্রায় সকল দলিল এ বইয়ে উল্লেখ রয়েছে। ভারতবর্ষে প্রতিনিধীত্বমূলক গণতন্ত্রের সূচনা, বিবর্তনের ইতিহাস, নারীদের আসন সংরক্ষণ এখানে আলোচিত হয়েছে।

১.৯ অনুকল্প গঠন ঃ

গবেষণায় অনুকল্প অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে আমি অতীত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বেশ কিছু বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছি। যা অনুকল্প হিসেবে উপস্থাপন করতে চাই।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার হলে-

১. নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হবে ;

২. গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর শক্তিশালী হবে এবং

৩. রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী বিধি মেনে নিয়ন্ত্রিত আচরণ করবে।

১.১০ গবেষণা প্রশ্নঃ

গবেষণা প্রশ্ন-১

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে কী ধরনের আন্দোলন তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে?

গবেষণা প্রশ্ন-২

নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী অনিয়ম প্রতিরোধে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে?

গবেষণা প্রশ্ন-৩

রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা নির্বাচন ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রভাবিত করে?

১.১১ সংস্কারের অভাবে নির্বাচনে বিরূপ প্রভাব পড়ে ঃ

নির্বাচন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অংশ। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধ, গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা, সুশাসন নিশ্চিত করণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এর জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে নির্বাচনে বিরূপ প্রভাব পড়ে।

বর্তমানে নির্বাচন মানেই টাকার ছড়াছড়ি। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জোরালো হয়ে উঠতে না পারায় এই অনাকাঙ্খিত ঘটনাগুলো ঘটেই চলছে। এ কারণেই পেশাদার ও নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদদের টাকার জোরে হটিয়ে দিয়ে কালো টাকার মালিকেরা সংসদে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ তৈরি করেছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গোড়া থেকে সামরিক-বেসামরিক আমলাদের আধিপত্য লক্ষ্যণীয়। ফলে রাজনীতিতে বিভিন্ন দল ভাঙ্গার ও নতুন দল গড়ার হিড়িক দেখা যায়। নেতৃত্ব অনেকটা পরিবারতান্ত্রিক, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক। ফলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিকাশ লাভ করছে না।

বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকট ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণেও শহরের মানুষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। যদিও সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। তাই নির্বাচন ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর ও বাস্তব সম্মত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক দলগুলো মাঝে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সমন্বয়ের অভাব, সহনশীলতার অভাব, ক্ষমতা লিপ্সা, বিরোধীদলের প্রতি কাঠোর মনোভাব, সর্বোপরি অগণতান্ত্রিক চর্চা বিদ্যমান রয়েছে। নির্বাচনে পেশীশক্তি ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারের ফলে নির্বাচনোত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতায় নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়।

আমরা সকলে যদি সম্মিলিত ভাবে ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ ও দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে ওঠে দেশ ও জাতির স্বার্থকে একমাত্র উদ্দেশ্য করে কাজ করি তবেই শুধু এর সমাধান সম্ভব। আর যদি এতে ব্যর্থ হই, ভবিষ্যৎ নিশ্চিত অন্ধকার।

১.১২ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ঃ

নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা।[৬] জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা তৈরি, ভোট গ্রহণ তত্ত্বাবধান, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনী অভিযোগ-মোকদ্দমা মীমাংসার লক্ষ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা নির্বাচন কমিশনের কাজ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম ভাগে নির্বাচন কমিশনের গঠন-কাঠামো, ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা আছে।

একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য কমিশনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকবে এবং নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনানুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে; সংসদ সংসদ্যসের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে; সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করবে; এবং রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করবে। যেখানে নির্বাচন সফল সেখানে গণতন্ত্রও সফল। কারণ গণতন্ত্র এবং নির্বাচন একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর আস্থা, আর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে সুষ্ঠু নির্বাচনের পথ সুগম করে। তাই নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন-স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে দিতে হবে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন অনেক গুরুত্ব বহন করে।

১.১৩ সীমাবদ্ধতা ঃ

গবেষণা কর্মটি স্বার্থক করে তোলার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু অনিবার্য কারণে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। উত্তর দাতাগণের ব্যাক্তিগত সময়সূচীর কারণে স্বাক্ষাৎকার সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। অনেকে স্বাক্ষাৎকার এ সময় দিতে চাননি। অনেক রাজনৈতিক কর্মী স্বীয় দলের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাই বিভিন্ন

কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। আমি অন্যান্য উৎসগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি এবং বিশ্লেষণে বস্তুনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করেছি। সকল বিষয় এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়নি। শুধুমাত্র 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন' এর আলোকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা, নির্বাচন পদ্ধতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সমস্যাবলী, সংস্কার আন্দোলন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.১৪ অধ্যায় বিন্যাস ঃ

"বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ", গবেষণা কর্মটি সর্বমোট আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকা ও গবেষণার প্রাথমিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গবেষণার যথার্থতা, প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, তাত্ত্বিক কাঠামো, তথ্য সংগ্রহ, পুস্তক পর্যালোচনা, অনুকল্প গঠন, গবেষণা প্রশ্ন, সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে নির্বাচন পদ্ধতি, নির্বাচন কমিশন ও এর ভূমিকা, আইনী কাঠামো ও বাংলাদেশের সাথে ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকার নির্বাচন পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭২-১৯৯০) পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে **১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮** সালের সংসদ নির্বাচন গুরুত্ব পাবে। দেড় দশকে অনুষ্ঠিত সকল সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ব্যবস্থা, ত্রুটি, ব্যর্থতা উঠে এসেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থা স্থান পাবে। এখানে তিন জোটের রূপরেখা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণা, ১৯৯১ এর নির্বাচন, প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ থেকে ১২ জুন ১৯৯৬ এর নির্বাচন, ২০০১ সালের নির্বাচন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৬-২০০৮, ২০০৮, ২০১৪ সালের নিবার্চন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থার সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুর্নীতি, সামরিক-বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য, নেতৃত্বের দুর্বলতা, আদর্শিক দোদুল্যমানতা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যা থেকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার অসঙ্গতি উঠে আসে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গটি গুরুত্ব হয়েছে। এখানে গণতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থার গুরুত্ব, নিরপেক্ষ নির্বাচন, নির্বাচনী সংস্কার, প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে নির্বাচনের উপর প্রভাব, সংস্কার আন্দোলন, নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার প্রসঙ্গে এফপিটিপি ও পিআর পদ্ধতি, জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইন, সংস্কার প্রস্তাব, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকা, উন্নয়ন সহযোগীদের অবস্থান, নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সংস্কার প্রস্তাব, নির্বাচনী সংস্কারে নারী প্রসঙ্গ এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে পরিচালিত আন্দোলন তৎপরতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিত করণ করা হয়েছে। গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নির্বাচিত প্রশ্নমালার আলোকে সাধারণ জনগণের মতামত জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ

করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে উপসংহার ও সুপারিশ সমূহ তুলে ধরা হয়েছে ।

সবশেষে সহায়ক গ্রন্থাবলী ও পরিশিষ্ট উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.১৫ তথ্যপুঞ্জী ঃ

১. Ahamed, E. (Eds.). (1980). *Bangladesh politics.* Centre for Social Studies, p.35

২. Mannan, M. A. (2005). *Elections and democracy in Bangladesh*. Academic Press and Publishers Library, p.2

৩. হোসেন, এম. সাখাওয়াত. (২০১৪). *বাংলাদেশে নির্বাচনী সংস্কার ১৯৭২-২০০৮*. চৌধুরী, রামেন্দ্র (অনুদিত). প্রথমা প্রকাশন, পৃ.১২৩

৪. Dhal, R. A. (Eds.). (1967). *Political Opposition in Western Democracies*. Yale University Press, p.xi.

৫. আখতার, মুহাম্মদ. ইয়াহ্ইয়া. (২০০৯). অভিনব সরকার ব্যতিক্রম নির্বাচন. এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত, ১১৮ (৪) ধারা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা

২.১ নির্বাচন ঃ

সমাজ নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। নিজেদের বিকাশ সাধনে মানুষ এ পরিবর্তনকে ভালোবেসে গ্রহণ করেছে। কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানবের সমর্থন নিয়ে এ পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। এভাবেই বিকশিত হচ্ছে মানব সভ্যতা। সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নির্বাচন হল এক প্রকার বাছাই প্রক্রিয়া। প্রাচীন গ্রীসের শাসন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ছিল নির্বাচন। স্থানীয় প্রধানের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে এবং মুঘল শাসনেও পাওয়া যায়। বাংলার গ্রামের লোকেরা নিজ নিজ গ্রামের গ্রাম প্রধান, পাটোয়ারী বা কর আদায়কারী নির্বাচন করত। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রসারের ফলে জনমনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সরকারের কার্যাবলী অবশ্যই ব্যাপক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। এ ধারণার ফল হলো নির্বাচন, নির্বাচকমন্ডলী ও প্রতিনিধি বাছাইয়ের।

পূর্বে নগর রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা দুই ছিল খুব কম। তাই সেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছিল। অর্থাৎ সকলে মিলে আইন প্রণয়ন ও শাসন কার্য পরিচালনা করত। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র আয়তন ও জনসংখ্যা উভয় ক্ষেত্রে বিশাল। তাই এ ধরনের বিশাল আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যা অধ্যূষিত জাতীয় রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব নয়। ফলে প্রয়োজন জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের। নির্বাচন হল জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি বাছাইয়ের সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি। অর্থাৎ যে মাধ্যমের দ্বারা জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার বলে তাদের নিজ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিনিধি মনোনীত করে তাই নির্বাচন। অ্যানাল বলের মতে নির্বাচন হল, The means by which the people choose and exercise some

degree of control over thier representatives.[১] নির্বাচন হল প্রতিনিধি বাছাই এবং সে প্রতিনিধির উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপের উপায় বিশেষ।

সাধারণ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের একটি মাত্র সময়, তা হলো নির্বাচন। নির্বাচনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে যে কথাটি, সেটি হচ্ছে ভোট। একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণ এ ভোটের মাধ্যমেই তার নিজ মতামত ব্যক্ত করে, গণতান্ত্রিক অধিকারটি প্রয়োগ করে থাকেন। শুধু নির্বাচন হলেই হবে না, নির্বাচনটি হতে হবে অবাধ, সুষ্ঠু, স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক। তবেই জনমতের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটবে, স্বার্থক হবে গণতন্ত্র।

> "A free and fair election brings the micro-institutions of governance closer to the people. People as stakeholders of democracy are subject to the authority of elected leadership and, therefore, can claim to share direct control over them. Election basically reflects three things: weight of public opinion, consideration of popular interest and broad-based representation of social, economic and political concerns of citizens. Election has other vital purposes too, such as selecting leaders, providing legitimacy to governance and making the government accountable to the electorates."[২]

২.২ নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

নির্বাচনকে নিয়ে যত কার্যক্রম তার সবকিছুকে নিয়েই নির্বাচন পদ্ধতি। নির্বাচন মানে ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন। নির্বাচনের গুরুত্ব নির্বাচন পদ্ধতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন পদ্ধতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ নির্বাচন প্রধানত দু'ধরনের হতে পারে। প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও পরোক্ষ নির্বাচন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ঃ

প্রাথমিক ভোট দাতারা যখন সরাসরি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন তখন তাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ নির্বাচন। এখানে সরাসরি ভোটারদের মতামত প্রকাশ পায়। ফলে প্রতিনিধিরা জনসাধারণের সাথে চমৎকার যোগাযোগ বজায় রেখে জনকল্যাণে সদা সচেষ্ট থাকেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বে পৃথিবীর আরো অনেক দেশের মতো ব্রিটেন, ভারত, বাংলাদেশের আইন পরিষদের সদস্যগণ এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন।

পরোক্ষ নির্বাচন ঃ

এ পদ্ধতিতে প্রাথমিক ভোট দাতারা সরাসরি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে না। তারা একদল মধ্যবর্তী লোক নির্বাচন করেন। পরবর্তিতে সে নির্বাচিত মধ্যবর্তী লোকেরা তাদের ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য দু'বার ভোট দিতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত হন।

ভোট দান পদ্ধতি দু'রকম হতে পারে। গোপন ভোট দান পদ্ধতি কিংবা প্রকাশ্য ভোট দান পদ্ধতি।

গোপন ভোট দান পদ্ধতি ঃ

এ পদ্ধতিতে নির্বাচনে একজন ভোটারকে ব্যালট পত্র প্রদান করা হয়। ব্যালট পত্রে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম লেখা থাকে। ভোটার তার মনোনীত ব্যক্তির নাম গোপনে চিহ্নিত করে ব্যালট পত্রটি ব্যালট বাক্সে রাখেন। আবার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম না থেকে প্রতীকও থাকতে পারে। ভোটপ্রদান অনুষ্ঠান শেষ হলে দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ প্রার্থির অথবা প্রার্থীর মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্সটি খুলে ভোট গণনা করে থাকেন। এটি নির্বাচনে ভোটারকে নানামুখী প্রভাব ও চাপ থেকে রক্ষা করে।

প্রকাশ্য ভোট দান পদ্ধতি ঃ

এ পদ্ধতিতে ভোটার সবার সামনে তার মনোনীত ব্যাক্তিকে ভোট প্রদান করেন। মন্টেস্কু মনে করেন, প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচন বিষয়ে অজ্ঞ, অর্ধশিক্ষিত জনগণ সমাজের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পরামর্শে বা অনুকরণে পরিচালিত বা প্রভাবান্বিত হতে পারে। জন স্টুয়ার্ট মিল মনে করতেন, জনসাধারণের যা কর্তব্য তা সকলের দৃষ্টির সামনে পালন করা উচিত। বিশ শতকের প্রথমদিকে অনেক রাষ্ট্রে প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ফলে অধিকাংশক্ষেত্রেই ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্বের প্রভাবে, নির্দেশে এবং কখনো কখনো জুলুমে ভোটদাতারা ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের মনোনীত ব্যক্তিকে ভোট দিতে বাধ্য হতো।[৩]

বর্তমান গণতান্তিক বিশ্বে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য দুটো সরকার ব্যবস্থা হলো রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি এবং সংসদীয় পদ্ধতি। উভয় শাসন ব্যবস্থাতেই দেশ ভেদে নির্বাচন পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন- ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন পদ্ধতি। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেবল জনগণের ভোটেই নয় 'ইলেকটোরাল কলেজ' প্রদত্ত ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। অন্যদিকে দুই দফায় প্রদত্ত ভোটে ফরাসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে

থাকেন। ফরাসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফায় সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় ভোটের প্রতিযোগিতা হয় এবং এভাবেই বিজয়ী নির্বাচন করা হয়।[৪] সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবেশে সাধারণত দুটি ভিন্ন নির্বাচন পদ্ধতি বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। একটি 'সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি' বা 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোষ্ট' (FPTP) পদ্ধতি। কমনওয়েলথভুক্ত বাংলাদেশ, ভারত সহ বিভিন্ন আফ্রো-এশীয় অঞ্চলের অধিকাংশ দেশেই অনুসরণ করা হয়। আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' ভিত্তিক নির্বাচন (PR) পদ্ধতি । নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোসহ অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশেই অনুসরণ করা হয়।[৫]

সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি বা 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোষ্ট' (FPTP) পদ্ধতিঃ

সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি বা 'ফাষ্ট পাস্ট দ্য পোষ্ট' পদ্ধতি হচ্ছে একেবারে প্রাথমিক বা ভিত্তিমূলক নির্বাচন-ব্যবস্থা, যেখানে একটি নির্বাচনী আসনে সর্বাধিক ভোট লাভকারী (অন্যান্য প্রার্থীর তুলনায়) প্রার্থীকেই বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। এ পদ্ধতিতে একজন প্রার্থী সংশ্লিষ্ট আসনের সামগ্রিক ভোটসংখ্যার ৫০ শতাংশের কম ভোট পেয়ে বিজয়ী হতে পারেন; ওই আসনের বিভিন্ন প্রার্থীর প্রাপ্ত মোট ভোটের ২০ শতাংশ বা কম পেয়েও বিজয়ী হয়ে এলাকার সব জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।[৬]

'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' (PR) পদ্ধতিঃ

'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' পদ্ধতি হচ্ছে এমন এক ধরনের পদ্ধতি, যার লক্ষ্য হচ্ছে শতকরা হিসাবের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রার্থী-গোষ্ঠীর প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে বিজিত আসনের নিকটতম সুষমতা বিধান করা।

'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' পদ্ধতির বিভিন্ন 'মডেল' প্রচলিত রয়েছে। দলীয় তালিকা নির্ভর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির আওতায় সংশ্লিষ্ট দলগুলো তাদের পছন্দের অনুসারে প্রার্থীদের তালিকা উপস্থাপন করে। তালিকাটি প্রকাশ্য কিংবা গোপনীয় হতে পারে।

‘গোপনীয় তালিকা’ পদ্ধতি অনুসরণ করা হলে ভোটাররা প্রার্থীকে নয় তালিকাটিকে ভোট দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি দল সর্বমোট যে পরিমাণ ভোট পায়, সে অনুপাতে দলীয় তালিকায় নির্ধারিত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্টসংখ্যক আসন বরাদ্দের (বিজয়ী) ঘোষণা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে ‘প্রকাশ্য তালিকা’র মডেল অনুসরণ করা হলে ভোটাররা তালিকাবদ্ধ প্রার্থীদের মধ্য থেকে একজন অথবা দুজন প্রার্থীর অনুকূলে ভোট দিতে পারেন, অথবা তালিকার ভিত্তিতেই ক্রমানুসারে নিজেদের পছন্দনীয় প্রার্থীর উল্লেখ করতে পারেন। ইউরোপ, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার বহু দেশ এবং ইসরায়েলও নির্বাচনের এ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।[৭]

‘মিশ্র আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব’ প্রক্রিয়ায় আনুপাতিক পদ্ধতি এবং ‘জেলা ভিত্তিক একক আসনের’ সমন্বয় করা হয়। যেসব দেশে জনসংখ্যা বিশাল, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু বিদ্যমান ও বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে ‘মিশ্র আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব’ পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন রকমের স্থানীয় ও জাতীয় ইস্যুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা সম্ভব হয়। বলিভিয়া, জার্মানি, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড সহ অনেক দেশে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।[৮]

২.৩ বঙ্গীয় আইন সভার বিকাশ ঃ

প্রাক-ব্রিটিশ যুগের সরকার পরিচালিত হতো নবাবের ইচ্ছা মাফিক। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিধি নিষেধ, সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত ছিল হুকুমত, যাকে আমরা সনাতন শাসনতন্ত্র বলে অভিহিত করি। ইংরেজ শাসকরা ইচ্ছাকৃতভাবে এ দেশে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টরী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাননি। তবুও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ইংরেজদের নিজ দেশের রাষ্ট্রচিন্তা ও বিধি ব্যবস্থা এ উপমহাদেশে আত্মপ্রকাশ করে। উপমহাদেশে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ক্রমান্বয়ে, ধাপে ধাপে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানিকীকরণকে বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী G.W Chowdhury "Democracy by instalments" বলে অভিহিত করেছেন।[৯] কোম্পানীর স্বৈরশাসনের মধ্য দিয়ে সূত্রপাত

ঘটে ঔপনিবেশিক শাসনের এবং ক্রমশ তা পশ্চিমা শাসনতান্ত্রিক আদলে রূপান্তরিত হয়। ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশের মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়ার সূচনা হয় এবং চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মধ্য দিয়ে। ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় রাজা ধারাকান্ত দেব ও দেবেন্দ্র ঠাকুরের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' যা সর্ব প্রথম বাংলায় প্রতিনিধিত্বমূলক আইন সভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ১৮৬১ সালের ১ আগস্ট ভারতীয় কাউন্সিল আইন ঘোষিত হয়। এ আইনে বঙ্গীয় আইন সভা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করা হয়। তবে কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি বা যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালি সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা ছিল না। শাসনতান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় বঙ্গীয় আইন সভার বিকাশ তথা নির্বাচিত প্রতিনিধি পাওয়ার ইতিহাসকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা-

(ক) প্রাথমিক পর্যায় **১৮৬২-১৯১১**

(খ) মধ্যবর্তী পর্যায় **১৯১২-১৯৩৪**

(গ) চূড়ান্ত পর্যায় **১৯৩৫-১৯৪৭**

(ক) প্রাথমিক পর্যায় (১৮৬২-১৯১১) ঃ

১৮৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, শনিবার, বঙ্গীয় আইন সভার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আইন সভায় ল্যাফটেনেন্ট গর্ভনর স্যার জন পিটার গ্যান্ট পদাধিকার বলে সভাপতি এবং বার জন মনোনীত সদস্য ছিলেন। বার জন সদস্যের মধ্যে চারজন সরকারি ও চারজন বেসরকারি বিদেশী এবং চার জন বাঙালি ছিলেন। বাঙালিরা হলেন মৌলভী আবদুল লতিফ, রাজা রাম মোহন রায়ের কনিষ্ঠ ছেলে রাজা রাম প্রসাদ রায়, জমিদার রাজা প্রতাপ চন্দ্র এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের চাচাতো ভাই প্রসন্ন কুমার ঠাকুর।[১০] আইন সভায় "Fines on Village for Outrages and Trespasses Committed" নামক শিরোনামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়। গণবিরোধী এ সংশোধনটি মৌলভী আব্দুল লতিফ ছাড়া সকলেই সম্মতি প্রদান করেন। তাছাড়া সকল প্রকার সরকার বিরোধী বক্তব্য, আন্দোলন ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ করবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের ১৮৭৮

সালে Vernacular Press Act নামক আইন বিনা বিরোধীতায় পাশ হয়।[১১] আইন সভার সদস্যবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করায় মফস্বলের নতুন নেতৃবৃন্দ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন থেকে বেরিয়ে এসে 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' গঠন করেন।[১২] বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা দেশের অন্যান্য স্থানের জাতীয়তাবাদীদের সাথে মিলে ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। 'কংগ্রেস' প্রথম অধিবেশনেই স্থানীয় আইন সভায় বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় নির্বাচিত সদস্য থাকার কথা প্রস্তাব করে।

১৮৯২ সালে সংস্কার আইন পাশ হয়। এ সংস্কার আইনে তেরো জন সদস্যের পরির্বতে বঙ্গীয় আইন সভায় একুশ জন সদস্য রাখার বিধান করা হয়। এর মধ্যে দশ জন ছিলেন মনোনীত সদস্য। ১৮৯২ সালের আইনে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ঐ আইনে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের কোন বিধান করা হয়নি। বেসরকারি সদস্যগণ বাজেট আলোচনা করতে পারতেন কিন্তু এ বিষয়ে ভোট প্রদানের অধিকার ছিল না। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বঙ্গীয় আইন সভায় বেসরকারি সদস্যদের অবস্থান প্রসঙ্গে বলেন-"কাউন্সিলের অভ্যন্তরে সরকারি সদস্যদের মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দেশ ও জনগণের স্বার্থ নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা বেসরকারি সদস্যদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল।[১৩] ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সুবিধার কথা উল্লেখ করে ১৯০৫ সালে বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় বিভক্ত করেন। এ সময় ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাবের নেতৃত্বে একটি নতুন দল সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি সংস্কার আইন পাশ হয়। এই সংস্কার আইনের ধারা অনুযায়ী ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর বঙ্গীয় আইন সভার নতুন কাঠামো ঘোষণা করে। উক্ত কাঠামোতে সতেরো জন সরকারি অফিসার ও একত্রিশ জন বেসরকারি সদস্যের বিধান করা হয়। এ আইনের প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কোন বিধান করা হয়নি।[১৪]

(খ) মধ্যবর্তী পর্যায় (১৯১২-১৯৩৪) ঃ

১৯১৩ সালের ১৮ জানুয়ারি নবগঠিত বঙ্গীয় আইন সভার উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে আইন সভার কার্যক্রম কিছুটা ব্যাহত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্যাপক বিস্তার লাভ করলে, ভারতের ভাইসরয় চেমসফোর্ড এবং সেক্রেটারি অব স্টেট মন্টেগুর যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালের ২০ আগস্ট একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী পার্লামেন্টে একটি সংস্কার আইন পাশ হয় এবং ১৯১৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর মন্টেগু চেমস্ফোর্ড সংস্কার প্রস্তাব রাজার অনুমতি পায় এবং তা আইনে পরিণত হয়। এ আইনে সত্যিকার অর্থে ভারতে প্রতিনিধিত্বকারী ব্যবস্থার সূচনা ঘটে বলে মনে করা হয়। এ আইনের অধীনে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচলন হয়। বঙ্গীয় আইন সভায় জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১১৪ জন করা হয়।[১৫] ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ১৯২০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সমস্ত ভারতে অসহযোগ আন্দোলন এবং মুসলিম লীগের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়। তখন প্রায় শতকরা ৮০ জন ভোটার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

১৯২৩ সালের নভেম্বরে বঙ্গীয় আইন পরিষদের দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন ছিল বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৩৯ সদস্য বিশিষ্ট বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ১১৪ আসনে মুসলিমলীগ ব্যতীত দলভিত্তিক বা দলগত ভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে স্বরাজ পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

সারণি :২.১

১৯২৩ সালের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
স্বরাজ পার্টি	৪২
কংগ্রেস	২৯
স্বতন্ত্র	২৫
ইউরোপীয়	১৮
মোট	১১৪

উৎস ঃ The Statesman (Calcutta), December-1, 1923

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরিত এ চুক্তিতে বলা হয় যে, যেখানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে শতকরা ৬০টি হিন্দু আসন এবং ৪০টি মুসলিম আসন থাকবে। আর যেখানে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে শতকরা ৬০টি মুসলিম আসন ও ৪০টি হিন্দু আসন থাকবে। ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে বেঙ্গল প্যাক্ট দলের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পায়।[১৬]

স্বরাজ পার্টির শক্তিশালী অবস্থান সরকারকে অনেকাংশে দায়িত্বশীল করে তোলে। স্বরাজীদের দৃঢ় প্রচেষ্টার কারণে সরকার কর্তৃক উত্থাপিত “Bengal Ordinance” এবং সংশোধনী এবং “Criminal Law Amendment Bill” টি বাতিল হয়ে যায়। বিলের বিপক্ষে ৬৯টি ভোট এবং পক্ষে ৬৩টি ভোট পড়ে।[১৭]

১৯২৬ সালে বঙ্গীয় আইন সভার তৃতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তখন স্বরাজ পার্টি পরাজিত হয়। কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। গর্ভনর আবদুল করিম গজনবী ও ব্যোমকেশ চক্রবর্তীকে নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। ঐ মন্ত্রি পরিষদ ‘গাজা চক্র’ মন্ত্রি পরিষদ নামে পরিচিতি ছিল।[১৮] এ কাউন্সিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে বিরোধী গ্রুপ কর্তৃক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন’, ঐ অনাস্থা প্রস্তাব গজনবীর

বিরুদ্ধে ৬৬-৬২ ভোটে এবং চক্রবর্তী বিরুদ্ধের ৬৮-৫৭ ভোটে পাশ হয়। এরপর অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয়। এর মাধ্যমে বঙ্গীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলের বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।[১৯]

(গ) চূড়ান্ত পর্যায় (১৯৩৫-১৯৪৭) ঃ

১৮৬১ সালে বঙ্গীয় আইন সভার যে সূচনা হয় তা পরিপূর্ণতা অর্জন করে **১৯৩৫** সালের ভারত শাসন আইনের দ্বারা। এ আইনে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ ও আইন সভার সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করা হয়। এ আইনের অধীনে **১৯৩৭** সালে রাষ্ট্রীয় আইন সভার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে **৩**টি দল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজা পার্টি অংশ গ্রহণ করে।

সারণি: ২.২

১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
কংগ্রেস	৫২
মুসলিম লীগ	৩৯
কৃষক প্রজা পার্টি	৩৬
তিপেরা কৃষক সমিতি	৫
স্বতন্ত্র মুসলিম	৪৩
স্বতন্ত্র হিন্দু	৩৯
হিন্দু ন্যাশনালিস্ট	৩
হিন্দু মহাসভা	২
ইউরোপীয়ান গ্রুপ	২৫
এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
ইন্ডিয়ান খ্রিষ্টান	২
মোট	২৫০

উৎস ঃ Islam, Syed. Serajul. (1992). *Bangal legislative assembly and constitutional development*. Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, p.293

১৯৪৬ সালে পুনরায় বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, কংগ্রেস ও সিপিআই (ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি) অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে।

সারণি: ২.৩

১৯৪৬ সালে বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
মুসলিম লীগ	১১৪
কংগ্রেস	৮৬
কৃষক প্রজা পার্টি	৪
সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন	১
স্বতন্ত্র মুসলিম	২
হিন্দু মহাসভা	১
স্বতন্ত্র হিন্দু	৬
এ্যাংলো ইন্ডিয়ান	৪
ইন্ডিয়ান খ্রিষ্টান	২
ইমারত পার্টি	১
ইউরোপীয়ান গ্রুপ	২৫
খ্রিষ্টিয় সমিতি	১
কমিউনিস্ট পার্টি	৩
মোট	২৫০

উৎস ঃ Islam, Syed. Serajul. (1992). *Bangal legislative assembly and constitutional development*. Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, p.296

সাধারণ নির্বাচন চালু হওয়ার পর বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে সদস্যগণ জনপ্রতিনিধি হিসেব কাজ করা শুরু করেন। নির্বাচন ব্যবস্থার বিকাশ এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটায়। যে নির্বাচন ব্যবস্থার সাথে এ অঞ্চলের

মানুষ পরিচিতি ছিল সময়ের আবর্তনে তা আত্মপ্রকাশ করে। বঙ্গীয় আইন সভার যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা গুণগত ও মর্যাদার দিক থেকে অনেক উন্নত মানের ছিলেন।

১৯৪৬ সালের ২৩ এপ্রিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এ সময় মন্ত্রিমিশন ভারতে উপস্থিত হয়। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন শীঘ্রই ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টির লগ্ন থেকেই পূর্ব বাংলায় গণতন্ত্রের বিকাশ এবং তার সার্থক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ রাজনৈতিক মহলের গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে পরিণত হয়।

২.৪ পাকিস্তান আমল ঃ নির্বাচন ব্যবস্থার সন্ধানে ঃ

পাকিস্তান তৈরি করার সময় অনেকে ধারণা করেছিলেন পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ যুগের চেয়ে ক্রমান্বয়ে বিকশিত হবে। কিন্তু দেখা যায় পাকিস্তানে শাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থা বা বঙ্গীয় আইন সভার চেয়ে আরো উন্নত না হয়ে আরো অবনত হয়। ঔপনেবিশক আমলের শাসন ব্যবস্থাকেই নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি হিসেবে বেছে নেয়-

> But though the Asian nationalist leaders spoke and fought against western Imperialism, by and large they did not challenge or reject the ideology and value system of western colonial mastres. [২০]

ব্রিটিশ যুগে যতটুকু গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল অচিরেই পাকিস্তানে সেটুকু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থারও অবসান ঘটে। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত প্রথম দিকে কিছু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের চেষ্টা করা হলেও অধিকাংশ সময় শাসিত হয় সামরিক শাসন দ্বারা। আর নির্বাচন হয়ে উঠে এক কল্পনার বিষয়। পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বদলে ঔপনিবেশে পরিণত হয়।

১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ সরকারের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের যাত্রা শুরু হয়। এ সময়কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ (১৯৪৭-৫৪)

(খ) দ্বিতীয় প্রাদেশিক পরিষদ (১৯৫৪-৫৮)

(ক) প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ (১৯৪৭-৫৪) ঃ

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট অবিভক্ত বাংলার প্রায় তিন পঞ্চমাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়। অবিভক্ত বঙ্গীয় আইন পরিষদের ১৪১ জন সদস্য এবং আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার ৩০ জন নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ যাত্রা শুরু করে।

সারণি: ২.৪

প্রদেশ ওয়ারী আইন সভার সংগঠন, ১৯৪৭-৫৪

প্রদেশ	বঙ্গীয় আইন সভা হতে আগত সদস্য	আসাম আইন সভা হতে আগত সদস্য	মোট আসন পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ
১. মুসলিম আসন	৯৮	১৮	১১৬
ক. সাধারণ	২০	৮	২৮
খ. নিম্নবর্ণের জন্য সংরক্ষিত	১৮	৩	১৮
২. খ্রিষ্টান	১	০	১
৩. জমিদার শ্রেণী	৩	০	৩
৪. বিশ্ববিদ্যালয়	১	০	১
৫. শ্রমিক	৩	১	৪
মোট	১৪১	৩০	১৭১

উৎস ঃ Chowdhury, Najma. *The legislative process in Bangladesh: Politics and functioning of the East Bengal legislature, 1947-58*, P-18

নির্বাচনের সন্ধানে ঃ

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব বাংলার গর্ভনর নিযুক্ত হন স্যার ফ্রেডারিক ক্লেমারস রোণ আর মূখ্যমন্ত্রী হন মুসলিম লীগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক বছরেই জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে ভাষা ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক স্বাধিকারের প্রশ্নে অব্যাহত মতানৈক্যের কারণে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য আওয়ামী মুসলীম লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টির মতো আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রশ্নে এই বিরোধ আরো ঘনীভূত হয়। বাঙালিদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন পাকিস্তানের পূর্বাংশে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করে। আর তা বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাকে উৎসাহিত করে। পার্ক ও হুইলারের মতে ঃ "ক্রমান্নয়ে পূর্ব পাকিস্তানিরা বুঝতে পারে যে, তাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং উন্নয়ন পশ্চিম পাকিস্তানিদের ইচ্ছার অধীন হয়ে পড়েছে, পূর্ব বাংলাকে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি ঔপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করছে। ভাষাকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বাংলাকে পরিহার করে উর্দুকে জাতীয় ভাষা হিসেবে জনপ্রিয় করার পদক্ষেপ গৃহীত হলে এই মনোভাব আরো ঘনীভূত হয়। কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগ সরকারের প্রতি এই অসন্তোষের পাশাপাশি প্রাদেশিক মুসলীম লীগ সরকারের দুর্নীতি এবং অদক্ষতা পরিস্থিতিকে আরো ঘোলাটে করে তোলে।[২১]

১৯৪৯ সালে মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন তাঁর নিজের জেলা ময়মনসিংহের একটি উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থীর পরাজয়ের ফলে শূণ্য আসনগুলোর উপ-নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করে দেন।[২২]

১৯৫৩ সালের শেষ দিকের প্রাদেশিক আইন সভার ৩৪টি আসন ছিল শূণ্য। G.W. Chowdhury মন্তব্য করেন-" এমনকি প্রাদেশিক আইন সভার কার্যকালও কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্দেশে বাড়ানো হয়, অথচ কেন্দ্রীয় আইন সভা নিজেই স্বাধীনতার পূর্বে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়েছিল"।[২৩]

(খ) দ্বিতীয় প্রাদেশিক পরিষদ (১৯৫৪-৫৮) ঃ

১৯৫৩ সালের ২৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক এবং পরবর্তীকালে সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব বাংলার জনগণের মুসলিম লীগের উপর আর কোন আস্থা নেই। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ঃ শেখ মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন, অক্টোবর-১৯৫৫) ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান দ্বিতীয় প্রাদেশিক পরিষদের যাত্রা শুরু হয় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে। ১৯৫৩ সালে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বাচনের প্রতি অনাগ্রহের কারণে তা ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বকালীন ভোটাধিকার এবং স্বতন্ত্র নির্বাচকমন্ডলী এই দুই নীতির ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী সীমানা নির্ধারণ কমিটি যথাসময়ে সরকারের কাছে এর চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করতে না পারায় নির্বাচন বিলম্বিত হয়।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা ১৯৫৩ সালের নভেম্বরে গৃহীত ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়। মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৪ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত পূর্ব বাংলার প্রথম অবাধ ও সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। যুক্তফ্রন্ট আইন পরিষদের মোট ৩০৯ আসনের মধ্যে এককভাবে ২২৮টি আসন লাভ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসন লাভ করে।

সারণি: ২.৫

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দল	নির্বাচিত প্রার্থীর সংখ্যা
যুক্তফ্রন্ট	২২৮ জন
আওয়ামী মুসলিম লীগ (যুক্তফ্রন্ট)	১৩ জন
কৃষক শ্রমিক পার্টি (যুক্তফ্রন্ট)	৪৮ জন
নেজামে ইসলাম (যুক্তফ্রন্ট)	২২ জন
খিলাফতে রাব্বানী (যুক্তফ্রন্ট)	২ জন
পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস	২৪ জন
ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি	৫ জন
তফসিলী ফেডারেশন	২৯ জন
গণ সমিতি (কংগ্রেস)	১৪ জন
মুসলিম লীগ	৯ জন
বৌদ্ধ	৯ জন
খ্রিস্টান	১ জন
মোট	৩০৯ জন

উৎসঃ রশিদ, হারুন-অর. (২০০৩). *বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০১)*, পৃ.১৬০

৩ এপ্রিল এ.কে.ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত রেষারেষি, শরিক দলগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক মত ভিন্নতার কারণে ১৯৫৪-৫৮ সাল পর্যন্ত মোট ছয়বার সরকার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়। সুদীর্ঘ ৯ বছর পর ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয় এবং এটি ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর হয় এবং কার্যকরী হওয়ার আড়াই বছরের মাথায় এটি বাতিল করা হয়। নতুন সংবিধান পাশ হওয়ার পরপরই ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে আওয়ামী লীগ জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যুক্ত নির্বাচন (Joint Election) ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে আহ্বান জানান। এ সময় কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক

পর্যায়ে রাজনীতি অতিমাত্রায় অস্থিতিশীল হয়ে পরে এবং কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা নিজের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য সামরিক-বেসামরিক আমলাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করেন। এর মাত্র ২০ দিন পরে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আইয়ুব খাঁন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল নেন। এর পরবর্তী এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি শাসিত হয়েছে এক নায়কতান্ত্রিক সামরিক শাসকদের অধীনে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে জেনারেল আইয়ুব খাঁন শাসনতন্ত্র বাতিল করলেন। ১৯৫৯ সালের ৬ আগস্ট জেনারেল আইয়ুব খাঁন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অযোগ্যতা সম্পর্কিত আদেশ এবডো (Elective Bodies Disqualification Order) ঘোষণা করেন। এর অধীনে সোহরাওয়ার্দী সহ ৭৮ জন রাজনৈতিক নেতা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত অযোগ্য বলে ঘোষিত হন।

জেনারেল আইয়ুব খাঁন তার ক্ষমতা দখলের এক বছরপুর্তি উপলক্ষে ১৯৫৯ সালের ২৬ অক্টোবর মৌলিক গণতন্ত্র (বেসিক ডেমোক্রাসি) অধ্যাদেশ জারি করেন। ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রাদেশিক উপদেষ্টা পরিষদ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্র (বেসিক ডেমোক্রাসি) অধ্যাদেশ জারি করেন। ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রাদেশিক উপদেষ্টা পরিষদ পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্রী সংস্থা গঠন করেন। এ অধ্যাদেশের অধীনে চার স্তর বিশিষ্ট একটি কাঠামো প্রবর্তন করা হয় এবং ইউনিয়ন পরিষদ ব্যাতীত অন্য সব নির্বাচন (দেশের প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পরিষদ) পরোক্ষ পদ্ধতিতে একটি নির্বাচকমন্ডলী (Electoral College) কর্তৃক সম্পন্নের ব্যবস্থা করেন। এ আদেশে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে পূর্ব পাকিস্তানে ৪০ হাজার ও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী

নির্বাচিত হবেন। পরের বছর ১১ জানুয়ারি উভয় পাকিস্তানের মৌলিক গণতন্ত্র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে সেনাপতি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খাঁন তার সকল অবৈধ কার্যক্রমকে বৈধতা দানের জন্য প্রহসনের আয়োজন করে।

১৯৬২ সালে পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ঃ

রাষ্ট্রীয় ছাত্র আন্দোলন চলার সময় সামরিক শাসনের অধীনে জেনারেল আইয়ুব খাঁন তার ক্ষমতা দখলকে বৈধতা দেওয়ার জন্য হঠাৎ করে ১৯৬২ সালের এপ্রিলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও ৭ মে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের দিন ধার্য করেন। এ নির্বাচন ছিল দলবিহীন। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের অধিকাংশ সেনাপতি আইয়ুব খাঁনের সমর্থক।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ঃ

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৬৪ সালের ২২ মার্চ ও ১৬ মে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মোট ১৩টি দল অংশগ্রহণ করে। দলগুলো হলো জেনারেল আইয়ুব খাঁনের কনভেনশন মুসলিম লীগ। কাউন্সিল মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, নেজামে ইসলাম, জামায়াতে ইসলামী, কৃষক শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি। নির্বাচনের সরকারি ফলাফল অনুযায়ী আইয়ুব খাঁনের সর্মথক কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রার্থীরা অধিকাংশ আসনে বিজয়ী হয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন ঃ

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে এক ভাষণে ঘোষণা করেন “এক ব্যক্তি, এক ভোট” নীতির ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। হঠাৎ করেই ১৯৭০ এর অক্টোবরে নির্বাচনের

তফসিল ঘোষণা করেন। এছাড়া ১৯৭০ সালের ৩০শে মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া দেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে একটি আইনগত কাঠামো জারি করেন।

ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়। পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যার কারণে ৫ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকটি এলাকায় ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১ এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[২৪] নির্বাচন পূর্ব প্রচারণায় শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে তার দলের ৬ দফা এবং ছাত্র সমাজের ১১ দফার উপর গণভোট বলে অভিহিত করেন।[২৫] ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের জনসংখ্যা অনুপাতে বিভিন্ন প্রদেশগুলোর জন্য আসন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়।

এ নির্বাচন ছিল পাকিস্তান সৃষ্টির ২৩ বছর পর অনুষ্ঠিত দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ নির্বাচন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ওয়ালী), পিপলস পার্টি, মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল ও আরো বেশ কিছু রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬০টি পুরুষ আসনে জয় লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সমস্ত পাকিস্তানের আসন সংখ্যা ছিল ৩০০টি পুরুষ ও ১৩টি নারী আসন। আওয়ামী লীগ ১৩টি নারী আসনের মধ্যে ৭টি নারী আসনও লাভ করে ফলে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা দাড়ায় (১৬০+৭=১৬৭)টি। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের একটি আসনও পায়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮১টি আসনে জয়ী হয় ভূট্টোর নেতৃত্বাধীন পিপলস পার্টি। পিপলস পার্টিও পূর্ব পাকিস্তানে একটিও আসন পায়নি। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে সমগ্র পাকিস্তানে যে প্রথম

সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ অর্জন করে এমন এক অভাবনীয় বিজয়...যা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায়নি।[২৬]

সারণি২.৬

পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	৭২.৫৭
ন্যাপ (মস্কো পন্থী)	৩৬	-	১.৮৩
ন্যাপ (পিকিং পন্থী)	১৫	-	.৩০
ইসলাম পছন্দ দলসমূহ	৫১৫	১	১৭.৮৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১৩৯	১	৭.৭২
সর্বমোট	৮৬৭	১৬২	১০০

উৎস ঃ রশীদ, হারুন-অর. *বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* ১৭৫৭-২০০০, পৃ.২৮২

সারণি: ২.৭

পশ্চিম পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
পাকিস্তানি পিপল্‌স পার্টি (পিপিপি)	১১৯	৮১	৪২.২
মুসলিম লীগ (কনভেনশন) মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১৫৮	১১	১০.২
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৬৯	৭	১০.৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)	২৭	-	১.৮
জামায়াত-ই-ইসলামি	৭৯	৪	৬.৫
অন্যান্য ইসলামী দল	১৪৭	১৪	১০.২
ন্যাপ (মস্কো পন্থী) ন্যাপ (পিকিং পন্থী) আওয়ামী লীগ স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১৯ ৪ ৯ ২২৩	৬ - - ১৫	১৮.৫
সর্বমোট	৮৫৪	১৩৮	১০০

উৎস ঃ রশীদ, হারুন-অর. *বাংলাদেশ: রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন* ১৭৫৭-২০০০, পৃ.২৮৩

২.৫ বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

গণতন্ত্র শাসন ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচক মন্ডলীর ন্যায় নির্বাচন পদ্ধতিরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কারণ নির্বাচন পদ্ধতির উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। নির্বাচন গণতন্ত্রের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনের দুটি প্রচলিত পদ্ধতি হলো (ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও (খ) পরোক্ষ নির্বাচন।

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় নির্বাচন পদ্ধতিই কার্যকর আছে। তবে রাষ্ট্রপতি ও সংরক্ষিত মহিলা আসন ছাড়া জাতীয় ও স্থানীয় সকল পর্যায়ে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলিত। সংবিধানের ১২২ (১) ধারায় উল্লেখ রয়েছে, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।[২৭]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়টি উল্লেখিত রয়েছে। এ সংক্রান্ত ৬৫(২) নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, আইনের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট আসন (Single territorial constituencies) থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে একজন করে নির্বাচিত তিন শত সদস্যের সমন্বয়ে সংসদ গঠিত হবে, যতদিন পর্যন্ত এ আইনের ধারাটি বলবৎ থাকবে (নির্বাচিত) সদস্যকে “সংসদ সদস্য” হিসেবে অভিহিত করা হবে। চতুর্দশ (সংবিধান) সংশোধনী আইন ২০০৪ অনুসারে এ ধারাই (৩) উপধারায় পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ৪৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ২০১১ সালের পুনঃসংশোধনীর ভিত্তিতে ওই আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৫০ করা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, ‘মহিলা সদস্যরা আইনানুসারে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মে পূর্বোল্লিখিত সংসদ সদস্যদের প্রদত্ত “একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট” (Single transferable vote)-এর মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।’ অবশ্য এ আইনে কোন মহিলার প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রার্থীতার বিষয়টি বারিত হয়নি।[২৮] আলোচ্য বিশ্লেষণ হতে বুঝা যায় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মোট ৩৫০টি

আসনের সংস্থান রয়েছে, এখানে ৩০০টি একক সংসদীয় আসনের সদস্যগণ বহুদলীয় ব্যবস্থায় ফাস্ট পাষ্ট দ্য পোষ্ট বা সহজ সংখ্যাধিক্য ভিত্তিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। অবশিষ্ট ৫০টি মহিলা আসনের জন্য সংসদে বিদ্যমান দলীয় সদস্যসংখ্যার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নিয়মে পরোক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) গণতান্ত্রিক ঃ

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে **১১** অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।[২৯]

(২) নির্বাচন কমিশন ঃ

বাংলাদেশের নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র নির্বাচন কমিশন রয়েছে। সংবিধানের **১১৮** (১) ধারায় উল্লেখ আছে, "প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশানরকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।"[৩০]

(৩) নিয়মিত নির্বাচিত অনুষ্ঠান ঃ

বাংলাদেশে নির্দিষ্ট সময়ে ও নিয়মিতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে কোন কারণে যদি কোন আসন শূন্য হয় তবে তা নির্ধারিত সময়ে উপনির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। সংবিধানের **১২৩** ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে-

উপধারা ৩ সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে

(ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং

(খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে

উপধারা (৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।[৩১]

(৪) সার্বজনীন ভোটাধিকার ঃ

বাংলাদেশে সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃত রয়েছে। জাতি, ধম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক বাংলাদেশের সকল সুস্থ নাগরিক ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়।

(৫) ছবি সহ ভোটার তালিকা ঃ

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিটি এলাকার জন্য ভোটার তালিকা থাকবে। বাংলাদেশে ছবিসহ ভোটার তালিকা কার্যক্রম রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রে "এক ব্যক্তি, এক ভোট" নীতি প্রচলিত রয়েছে।

(৬) সহজ ভোট পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশের ভোট পদ্ধতি অত্যন্ত সহজ ও সরল। প্রার্থীর নাম ও প্রতীক সম্বলিত ব্যালট পত্রের যে কোন এক স্থানে ভোটারগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীল ব্যবহার করেন।

(৭) গোপন ভোট পদ্ধতি ঃ

বাংলাদেশে প্রতিটি নির্বাচনে গোপন ভোটদান পদ্ধতির ব্যবস্থা রয়েছে। নির্বাচনের সময় ভোট কেন্দ্রের বুথে বেষ্টনী দিয়ে ভোটারদের ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়।

(৮) একক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনী এলাকা ঃ

আয়তন ও জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে সমগ্র বাংলাদেশকে একক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন প্রতিনিধি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন।

(৯) স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ঃ

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় এক নতুন সংস্করণ হল স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স। আধুনিক বিশ্বের সাথে সমন্বয় রেখে নির্বাচনকে আরো স্বচ্ছ করতে এ ব্যবস্থা আরো ফলপ্রসূ হবে।

২.৬ বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ঃ[৩২]

নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা। জাতীয় ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা তৈরি, ভোট গ্রহণ তত্ত্বাবধান, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা এবং নির্বাচনী অভিযোগ-মোকদ্দমা মীমাংসার লক্ষ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা নির্বাচন কমিশনের কাজ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সপ্তম ভাগে নির্বাচন কমিশনের গঠন-কাঠামো, ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা আছে।

বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে ঃ

নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা ঃ

সংবিধানের ধারা ঃ **১১৮**

(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।

(২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং

(ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না;

(খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

(৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন।

(৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না।

(৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগ স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ঃ

সংবিধানের ধারা ঃ **১১৯**

(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী

(ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(খ) সংসদ সংসদ্যসের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন;

(গ) সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং

(ঘ) রাষ্ট্রপতি পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্ব সমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।

নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ ঃ

সংবিধানের ধারা ঃ **১২০**

এই ভাগের অধীন নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যেরূপ কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে, নির্বাচন কমিশন অনুরোধ করিলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনকে সেইরূপ কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

প্রতি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটার তালিকা ঃ

সংবিধানের ধারা ঃ **১২১**

সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করিয়া ভোটার-তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না।

ভোটার-তালিকায় নামভূক্তির যোগ্যতা ঃ

সংবিধানের ধারা ঃ **১২২**

(১) প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়;

(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে;

(ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং

(ঙ) তিনি **১৯৭২** সালের বাংলাদেশ যোগসাজসকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত না হইয়া থাকেন।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ঃ

সংবিধানের ধারা ঃ **১২৩**

(১) রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে মেয়াদ সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই হইতে ষাট দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন সেই সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর নব্বই দিনের মধ্যে, তাহা পূর্ণ কবিরার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে

(ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে; এবং

(খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া যাইবার পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যাক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লেখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ-সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না।

(৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূরণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোন দৈব-দুর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবতী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা ঃ

সংবিধানের ধারা ঃ **১২৪**

এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন-সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা ঃ

সংবিধানের ধারা ঃ **১২৫**

এই সংবধিানের যাহা বলা হইয়াছে তাহা স্বত্ত্বেও

(ক) এই সংবিধানের **১২৪** অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য আসন বন্টন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না;

(খ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান-অনুযায়ী কর্তৃক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(গ) কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বতী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।

নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান ঃ

সংবিধানের ধারা ঃ **১২৬**

নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।

২.৭ নির্বাচন পদ্ধতির জন্য আইনি কাঠামো ঃ[৩৩]

নির্বাচন পদ্ধতির জন্য আইনি কাঠামো হলো, নির্বাচন সংক্রান্ত আইন বিধান। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা, প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারীদের আচরণ ব্যাখ্যা করা এবং এ সম্পর্কিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান সুনিশ্চিত করা নির্বাচনী আইনের লক্ষ্য।

গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ (RPO): ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নম্বর ১৫৫ অনুযায়ী জারিকৃত এ মূল আইনের ভিত্তিতেই বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কতৃত্বপ্রাপ্ত হয় এবং সংবিধানের নির্দেশ মোতাবেক অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতার অধিকারী হয়। এ আইন নির্বাচন সংক্রান্ত সাংবিধানিক সংস্থানের পরিপূরক। এ আইন ১৯৭২ সালের ২৬ ডিসেম্বর জারিকৃত রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নম্বর ১৫৫ অনুসারে বলবৎ করা হয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সবকিছু গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ অনুসারেই নির্ধারিত হয়ে থাকে।[৩৪]

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়। সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দান করেন। নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনের আওতায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এর আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ প্রণীত হয়। এসব আদেশ ও বিধিমালার সমন্বয়েই নির্বাচনী আইন গঠিত।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এ আদেশের ৩ ধারায় উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। আদেশের ৫ ধারা বলে নির্বাচন কমিশন যে কোন ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষকে তার যেরূপ দায়িত্ব পালন এবং যেরূপ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন সেরূপ দায়িত্ব বা সহায়তা প্রদানে নির্দেশ দিতে পারেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ ৭ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এক বা একাধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন। বিধিবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত। সহকারি রিটার্নিং অফিসারগণও রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে রিটার্নিং অফিসারের কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। আদেশের ৭ ধারা বলে নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কোন কর্মকর্তা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধা দান বা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার মতো কোন কাজ করলে, নির্বাচন কমিশন যেকোন সময় নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাকে বা তাদের অব্যাহতি দিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন। ৯ ধারায় রিটার্নিং অফিসারকে ভোট গ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশ্যে একটি প্যানেল তৈরির কথা বলা হয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১১ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ নির্ধারণ ও প্রচারে নির্বাচন কমিশনকে প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১২(১) ধারায় জাতীয় সংসদের সদস্যপদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে। ১৩ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানত প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। ১৪ ধারায় মনোয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের উপর অর্পিত রয়েছে। ১৪(৫) ধারায় রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক মনোয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের নিকট

নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়েরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৫ ধারায় বৈধ মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। ১৬ (১) ও ১৬ (২) ধারা অনুসারে বৈধভাবে মনোনীত যে কোন প্রার্থী তার নিজ স্বাক্ষরে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

আদেশের ১৭(১) ধারায় বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচন বাতিলের কথা বলা হয়েছে। ১৯ ধারায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। ২০ ধারায় নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পছন্দ অনুযায়ী প্রতীক বরাদ্দের বিধান রয়েছে। ২০(২) ধারা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্পর্কিত পোষ্টার প্রত্যেকে ভোট কেন্দ্রে প্রদর্শন করতে হবে। ২১ (১) ধারায় প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী এজেন্ট এবং ২৭(২) ধারা অনুসারে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ৮ ধারার (২), (৩) অথবা (৪) উপধারায় বর্ণিত ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পোস্টার ব্যালটে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

আদেশের ৩৭ ধারায় প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একত্র করা এবং ৩৭(৫) ধারায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা তার প্রতিনিধির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট পুনঃগণনার বিধান রয়েছে। ৩৯(১) ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। আদেশের ৪৪-ক, ৪৪-খ, ৪৪-গ ধারায় নির্বাচনী ব্যয়, ব্যয়ের উৎস নির্ধারণী, নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা এবং নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের সময়সীমা উল্লেখ করা হয়েছে। ৪৯(১) ধারা অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে কোন প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

আদেশের ৭৩ ধারার ৪৪-ক ও ৪৪-খ এর বিধান লঙ্ঘন, ঘুষ গ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ, নির্বাচনে অসঙ্গত প্রভাব খাটানো, কোন প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যে বিঘ্ন সৃষ্টি বা তার

নিজস্ব বা আত্মীয় স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোন প্রার্থীর প্রতীক বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোন প্রার্থীর বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দানের আহ্বান বা প্ররোচিতকরণ, ভোটার উপস্থিতিতে বা ভোটদানের বাধা দান এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘুষ গ্রহণকে দুর্নীতিমূলক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ৭৪ ধারায় বেআইনি আচরণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ৭৮ ধারায় ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত থেকে পূর্ববতী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সকল স্থানে জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান ও তাতে যোগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ বিধান লঙ্ঘিত হলে ৭৮(২) ধারা অনুসারে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদন্ড এবং অর্থ দন্ড হতে পারে। ৮০ ধারায় ভোটকেন্দ্রের কাছে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য জরিমানাসহ উর্ধ্বে ৩ বছর, নিম্নে ৬ মাস কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে (কগনিজিবল অফেন্স)। ৮১(১) ধারায় ব্যালট চুরি, জালভোট দান, সীলমোহর ভেঙ্গে ফেলা, নির্বাচন পরিচালনায় বাধা দান প্রভৃতি অবৈধ হস্তপেক্ষের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছর জরিমানাসহ সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থ দন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। (কগনিজিবল অফেন্স)।

আদেশের ৮৪ ধারায় বলা হয়েছে, নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন সদস্য প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করলে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদন্ড এবং অর্থ দন্ডে দন্ডিত হবেন (কগনিজিবল অফেন্স)। ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত থেকে কোন ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করলে তিনি জরিমানাসহ উর্ধ্বে ৫ বছর, নিম্নে ১ বছর কারাদন্ড এবং অর্থ দন্ডে দন্ডিত হতে পারেন। ৯১ ধারা অনুসারে বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন এবং চাপসহ অন্যান্য আচরণমূলক কার্যকলাপ চালু থাকার কারণে সুষ্ঠু ও আইন সম্মতভাবে নির্বাচন

অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি বলে মনে হলে নির্বাচন কমিশন যে পর্যায়ে যেকোন ভোট কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন। ৯১-খ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য এ আদেশের সাথে অসামঞ্জস্য নয় এরূপ আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ঃ

সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯১ জারি রয়েছে। এ আইন দ্বারা নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ (১৯৯০ সালের অধ্যাদেশ নং-৩১) রহিত করা হয়। এ আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরি ও তার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি জারি রয়েছে। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে কোন ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে, তিনি কমিশন বা ক্ষেত্র বিশেষে রিটার্নিং অফিসারের কাছে গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া তার দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করতে পারবেন না। নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তার চাকুরির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরিরত আছেন বলে গণ্য হবেন।

এ আইনের ৫ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার শৃঙ্খলামূলক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কোন নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রদত্ত নির্বাচন কমিশন বা ক্ষেত্রবিশেষে রিটার্নিং অফিসারের কোন আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করলে তা অসদাচরণ বলে গণ্য হবে এবং ওই অসদাচারণ তার চাকুরিবিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫ঃ[৩৫]

বিধি ৪ অনুযায়ী কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ হতে অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন পূর্ব সময়ে নির্বাচনী এলাকায় কোন প্রকার চাঁদা বা অনুদান বা উপঢৌকন প্রদান করতে বা প্রদানের অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে পারবেন না।

বিধি ৭ অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচারণায় কোন প্রকার পোস্টার ব্যবহার করা যাবে না।

বিধি ৮ অনুযায়ী ভোট কেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে ভোটার স্লিপ বিতরণ করা যাবে না।

বিধি ৯ অনুযায়ী নির্বাচনী প্রচারণায় কোন বাস, ট্রাক, নৌযান, মোটর সাইকেল কিংবা অন্য কোন যান্ত্রিক বাহন নিয়ে কোন মিছিল, জনসভা কিংবা কোনরূপ শোডাউন করতে পারবেন না।

বিধি ১১ অনুযায়ী কোন দেয়াল লিখন বা অংকন করে কোন নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবে না।

বিধি ১২ এ বলা হয়েছে প্রতীক হিসেবে জীবন্ত প্রাণী ব্যবহার করা যাবে না।

বিধি ১৬ (খ) অনুসারে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণায় অসৎ উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করা যাবে না।

বিধি ২৭ অনুযায়ী কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি নির্বাচন পূর্ব সময়ে এ বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করলে এটি অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এ জন্য তিনি ৬ মাসের কারাদন্ড অথবা অনধিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হবে।

গণতান্ত্রিক সকল দেশেই অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আইনি কাঠামো রয়েছে। আমাদের দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা যে ক্রটি মুক্ত তা নয়। প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। বাংলাদেশে নির্বাচন পদ্ধতির জন্য যে আইনি কাঠামো তা যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য শুধুমাত্র আইন নয়, পাশাপাশি প্রয়োজন সুন্দর রাজনৈতিক সংস্কৃতি। সব মিলেই অর্থবহ হবে গণতন্ত্র।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

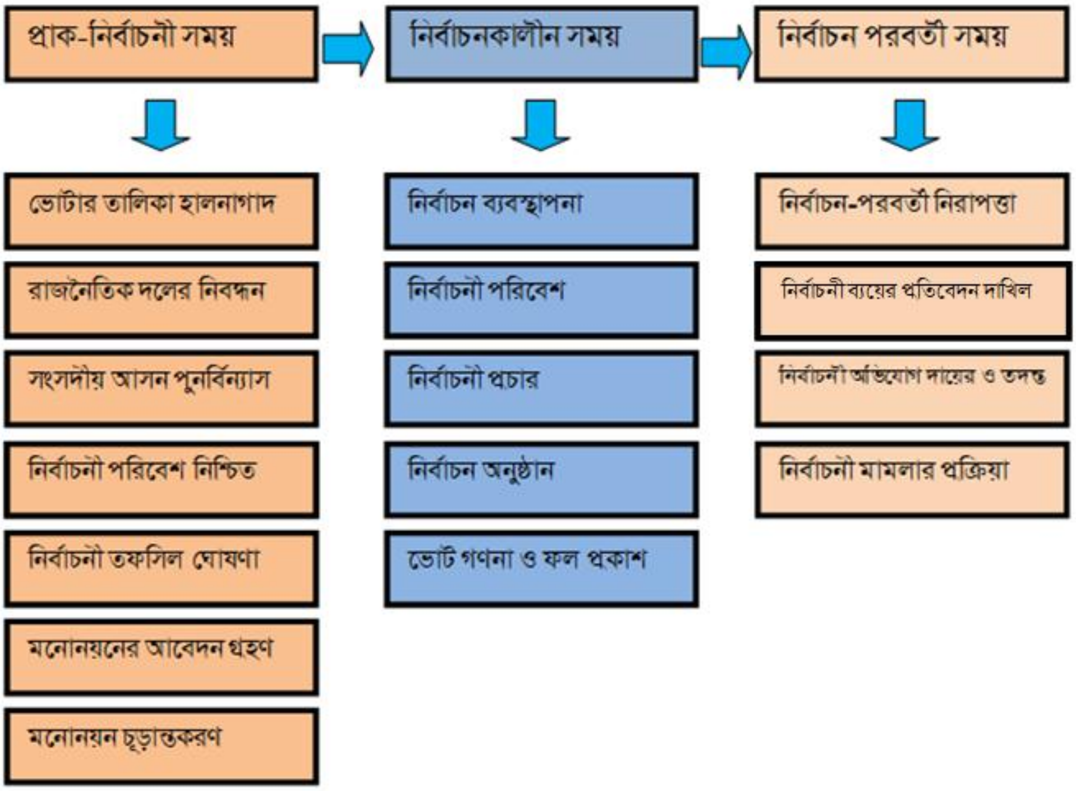

২.৮ ঃ ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকার নির্বাচন পদ্ধতি ও তুলনামূলক পর্যালোচনা ঃ

দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য আমাদের দেশের মত একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং এ অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রায় একই রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান। তাই গবেষণা কর্মটিতে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হলো।

দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশই নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটানে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন রয়েছে। রাজকীয় ভুটানে গণতহবিল আইন জারির মাধ্যমে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ব্যয় মেটাতে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্ধ করে। এ অঞ্চলে এটাই প্রথম। নেপাল প্রথমবারের মত মিশ্র পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করে। এ বিষয়টিও নতুন। প্রতিটি দেশেই রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন করা হয়। এ ক্ষেত্রে নেপাল অনেক অগ্রসর।

ভারতে নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

পৃথিবীর একটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত। ভারতের শাসন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। দেশটির নির্বাচনে 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা পদ্ধতি' ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ব্রিটিশ আমল থেকেই অনুসরণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে রয়েছে আলাদা আলাদা আইনসভা। কেন্দ্রের আইনসভার নাম সংসদ। ভারতীয় সংসদ দুই কক্ষ বিশিষ্ট- লোকসভা ও রাজ্যসভা। লোকসভায় আছে ৫৪৩টি আসন। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দেশের জনগণ এ ৫৪৩টি আসনের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর হয়। রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যা ২৪৫। এঁদের মধ্যে ২৩৩ জনকে নির্বাচিত করেন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আইনসভার সদস্যগণ। রাজ্যসভার সদস্যদের মেয়াদ ৬ বছর। প্রতি ২ বছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর

গ্রহণ করেন। রাজ্যসভার অন্য ১২ জন সদস্যকে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে মনোনয়ন করা হয়।

ভারতে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্য সচিব সুকুমার সেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে যোগ দেন। একজন মাত্র সদস্য নিয়ে ভারতে নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের সূচনা হয়। সর্বনিম্ন ২১ বছর বয়সী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের প্রথম ভোটার তালিকা করা হয়। তখন ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ১৮ কোটি। ১৯৮৯ সালে সাংবিধানিক পরিবর্তনের মাধ্যমে আরো দুজন কমিশনারের সংস্থান করে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে কমিশনারদের পদগুলো সাংবিধানিক মর্যাদা পেয়েছে। সিইসি ও কমিশনারদের মেয়াদ নিয়োগের দিন থেকে ছয় বছর অথবা ৬৫ বছর বয়স- যেটি আগে হয়। নিয়োগ ব্যবস্থা প্রায় বাংলাদেশের মতোই। ভারতে নির্বাচনে আচরণবিধি মেনে চলার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়। ২০০৪ সাল হতে প্রার্থীগণ হলফনামা উপস্থাপন করেন। ১৯৯৮ সালের সংশোধনীর আওতায় নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের ব্যয় ১০ থেকে ২৫ লাখ রুপি করা হয়। ভারতের নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM) ব্যবহার চালু হয়েছে, রয়েছে ছবি সহ ভোটার তালিকা। ২০১০ সালের ৩১ আগষ্ট ভারতের গণপ্রতিনিধিত্ব আইন সংশোধনের মাধ্যমে অনাবাসী ভারতীয়রা নির্বাচনে ভোট প্রদানের অধিকার পান।[৩৬]

ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা যে ত্রুটি মুক্ত তা নয়। নির্বাচন ব্যবস্থার নানা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা কাজে লাগিয়ে ফ্যাসিস্ট একত্ববাদ সৃষ্টি হয়, দেখাদেয় সাংস্কৃতিক বৈপরীত্ব, অভিশপ্ত বর্ণবাদ। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লেখিকা অরুন্ধতী রায় বলেন, "গণমানুষের বিস্ফোরণ একদিন না একদিন ঘটবেই। আমি বিপ্লবের কথা বলছি না। আমি বিক্ষোভের কথা বলছি, আমি এনজিও ঘরানার বাইরের সামাজিক আন্দোলনের কথা বলছি। এটা

ঘটবেই। আর তার ফলে তৈরি হবে নতুন শক্তি, নতুন বিরোধী কাঠামো। আমাদের একটা নিরপেক্ষ খেলার মাঠ তৈরি করতে হবে, যেখানে ফলাফল পূর্বনির্ধারিত থাকবে না।”[৩৭]

পাকিস্তানে নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র পাকিস্তান। দেশটিতে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় পাঁচ বছরের জন্য। মোট আসন ৩৩৬টি। এখানে সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থীদের জন্য বরাদ্দকৃত আসন ২৬৬টি। ১০টি আসন অমুসলিমদের ও ৬০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ১৩৪টি আসন। জাতীয় পরিষদ গঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও বিরোধী দলীয় নেতার সমন্বয়ে। পাকিস্তানে ইলেক্টোরাল কলেজের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন প্রেসিডেন্ট। দেশটিতে চারটি প্রদেশ ও একটি অঞ্চল রযেছে। প্রদেশগুলোর মধ্যে জাতীয় পরিষদের জন্য খাইবার পাখতুনখোয়ার ৪৫টি আসন, পাঞ্জাবের ১৪১টি আসন, সিন্ধু প্রদেশে ৬১টি আসন ও বেলুচিস্তান প্রদেশে ১৬টি প্রাদেশিক আসন রয়েছে। অঞ্চলের মধ্যে ইসলামাবাদের তিনটি আসন রয়েছে। পাকিস্তানে সিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তবে এটি আলাদাভাবে হয়। সিনেটে মোট আসন ১০০টি। এর মধ্যে সাধারণ আসন ৬২টি, টেকনোক্র্যাট বা ওলামা ১৭টি ও সংখ্যালঘুদের জন্য ৪টি আসন বরাদ্দ। স্বায়ত্বশাসিত হওয়ায় আজাদ কাশ্মীর ও গিলগিত-বেলুচিস্তানের নির্বাচন সাধারণ নির্বাচনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩৮]

১৯৫৬ সালে জারি করা শাসনতন্ত্রের ১৩৭ নম্বর ধারা অনুসারে ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ভোটার তালিকা প্রণয়ন, নির্বাচন পরিচালনা, নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল নিয়োগ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে। ১৮ তম সংশোধনীর পর হতে সরকারি ও বিরোধীদলীয় সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংসদীয় কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ দেয়া হয়। নির্বাচন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে একটু পার্থক্য রয়েছে। পাকিস্তানের

সংবিধানের ২১৩ নম্বর ধারায় নির্বাচন কমিশনের যোগ্যতা ও গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা হাইকোর্টে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের মধ্যে যাঁরা সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্য, তাঁদের মধ্য হতেই সিইসি নিয়োগ দেয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের অপর চার জন সদস্য, অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনারদের একেকজনকে পাকিস্তানের একেকটি প্রদেশের হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারি প্রিসাইডিং অফিসারদের এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশের মতোই সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নিয়োগ করা হয়। পাকিস্তানে নির্বাচন পরিচালনার জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৭৬ রয়েছে। আইনটি ভারতের গণপ্রতিনিধিত্ব আইন ও বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের প্রায় অনুরূপ। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সহজ সংখ্যাধিক্য ভিত্তিক পদ্ধতিতে। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচন হয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে।[৩৯]

পাকিস্তানের বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থা অনুসরণ করে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করার পক্ষে অনেক বিজ্ঞজন মত প্রকাশ করেন। যেখানে বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা নির্বাচন পরিচালনায় সম্পৃক্ত থাকেন। যখন রাজনৈতিক সরকারের অধীনে আইন অনুযায়ী নির্বাহী কর্মকর্তারা নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন, তখন তারা ক্ষমতাসীনদের নির্দেশনার বাইরে যেতে পারেন না।[৪০]

নেপালে নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

ধর্ম নিরপেক্ষ এ রাষ্ট্রটিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রায় ২৪০ বছর ধরে নেপালে রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। ২০০৮ সালে রাজতন্ত্রের অবসান হয়। নেপাল প্রথমবারের মত এ অঞ্চলে মিশ্র আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির সূচনা করে।

নেপালে ২০১৫ সালে হতে সংবিধান কার্যকর হয়। নেপালের আইনসভা দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এর একটি হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ অন্যটি ফেডারেল পার্লামেন্ট বা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি। হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ বা নিম্ন পরিষদে ২৭৫টি আসন। এর মধ্যে সংবিধানের ৮৪ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ১৬৫টি আসন সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে সরাসরি- (FPTP), ১৬৫ সংসদীয় নির্বাচন আসন থেকে এবং ১১০টি আসনে আনুপাতিক হারে নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। মেয়াদ ৫ বছর। এখানে আনুপাতিক হারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য সমগ্র দেশটিকে একক নির্বাচনী এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর অর্থ ১১০ জন সংসদ সদস্য পার্টি ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন, তবে তারা কোনো বিশেষ সংসদীয় এলাকাকে প্রতিনিধিত্ব করবেন না, যেমনটা করবেন ১৬৫ জন সদস্য। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মেয়াদ ৬ বছর। সদস্য সংখ্যা ৫৯ জন।

নেপালে ২০০৬ সালের শেষ দিকে একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ পদ্ধতি ও কার্যাবলী, দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয় ২০০৭ সালের ১৫ জানুয়ারি জারি করা অন্তবর্তী সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছিল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহ নেপালে নির্বাচন কমিশনে পাঁচজন সদস্য। তাঁরা ছয় বছরের জন্য নিয়োগ পেয়ে থাকেন। সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনে অভিসংশনের মাধ্যমেই কেবল তাঁদের অপসারণ করা যেতে পারে। নেপালে ৬০০ স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ একটি সচিবালয় রয়েছে। রয়েছেন ৭৫ জন ডিস্ট্রিক ইলেকশন অফিসার। বাংলাদেশ ও ভারতের মতোই নেপাল নির্বাচন কমিশনকেও রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার হিসেবে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিতে হয়। নেপাল নির্বাচন কমিশন সংসদের কাছে আইন সংক্রান্ত পরামর্শ উপস্থাপন করে। বাংলাদেশের মতোই নেপাল নির্বাচন কমিশনের বিধিবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে। এখানে নির্বাচনে আগ্রহী দলগুলোর নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত হওয়া বাধ্যতামূলক।[৪১] নেপালে পার্টি এবং সংসদে ৩৩ শতাংশ নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

ভুটানে নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

পৃথিবীর নবীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভুটান। ভুটানে ২০০৮ সাল পর্যন্ত রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় কোন নির্বাচন হয়নি। প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৮ সালের ২৪ মার্চ। গণতান্ত্রিক অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ভুটানের নির্বাচন ব্যবস্থায় অনেক পার্থক্য রয়েছে। ভুটানের সংবিধানের ২৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সরকারের ভিত্তি হবে সাধারণ জনগণের ইচ্ছা এবং জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন হবে নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে। জন্মসূত্রে ন্যূনতম ১৮ বছর বয়স্ক ভুটানি নাগরিকেরা সরকার গঠনে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। ২০০৮ সালের আইনে 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোষ্ট' পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ভুটান সরকার 'রাজকীয় ভুটানের গণতহবিল আইন' জারির মাধ্যমে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় মেটাতে সরকারি তহবিল হতে অর্থ বরাদ্ধ করে। অর্থ বরাদ্ধের মূল লক্ষ্য হলো সব রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি। ভুটানের নির্বাচন কমিশন প্রথম নির্বাচনেই ভোটারদের পরিচয়পত্র প্রদান ও 'ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন' ব্যবহার করে।[৪২]

ভুটানের আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট এবং দ্বিদলীয়। মেয়াদ ৫ বছর। আইনসভার উচ্চকক্ষ ন্যাশনাল কাউন্সিল এবং নিম্নকক্ষ ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি হিসেবে পরিচিত। ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির আসন সংখ্যা ৪৭টি। ন্যাশনাল কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ২৫ জন। ভুটানের ২০টি প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় জেলা হতে ২০ জন প্রার্থী সরাসরি 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোষ্ট' পদ্ধতিতে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্য হতে বাকি ৫ জনকে রাজা নিজ ক্ষমতাবলে নির্বাচিত করেন। ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির বিজয়ী দলই দেশটিতে সরকার গঠন করে। সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দেশটির ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির নির্বাচন দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন হতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত সকল রাজনৈতিক দল প্রথম পর্বে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রথম পর্বের বিজয়ী দুই দল দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচনে অংশ গ্রহনের যোগ্যতা অর্জন করে। দ্বিতীয় পর্বের নির্বাচনে

রাজনৈতিক দল দুইটির প্রার্থীদের সংসদীয় আসনগুলো হতে জনগণের সরাসরি ভোটে 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোষ্ট' পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতে হয়। দ্বিতীয় পর্বের বিজয়ী দল দেশটিতে সরকার গঠন করে এবং পরাজিত দল বিরোধী দলের আসন গ্রহণ করে। ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলির মেয়াদ সংসদে প্রথম বসার তারিখ হতে পরবর্তী ৫ বছর, মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে পুনরায় ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি গঠনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।[৪৩] ভুটানে প্রধান বিচারপতি প্রধান উপদেষ্ঠা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।[৪৪]

মালদ্বীপে নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

দক্ষিণ এশিয়ার একটি দ্বীপ রাষ্ট্র মালদ্বীপ। দেশটি **১১৯২**টি মনোরম প্রবাল দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত হলেও মাত্র **১৯৮**টিতে লোক বসতী রয়েছে। প্রশাসনিক সুবিধার্থে দেশটিকে ২০ অ্যাটল (দ্বীপ) প্রশাসনিক এককে ভাগ করা হয়েছে। দেশটি **১৯৬৫** সালে ব্রিটিশ উপনিবেশ হতে মুক্তি পায়। মালদ্বীপে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ব্যবস্থা রয়েছে যেখানে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকারপ্রধান উভয় দায়িত্ব পালন করেন। একবার নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পুণরায় দ্বিতীয় ৫ বছরের মেয়াদে পুনরায় নির্বাচিত হতে পারে যা সংবিধান দ্বারা অনুমোদিত সীমা।

মালদ্বীপে রাষ্ট্রপতি সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ বা পঞ্চাশ শতাংশের বেশি (৫০%) ভোটে নির্বাচিত হন। যখন প্রার্থীদের তালিকা থেকে কোনো প্রার্থীই প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান না তখন নির্বাচনটি রানঅফ (বা দ্বিতীয় রাউন্ড) এ চলে যায় যা প্রথম রাউন্ডে সবচেয়ে বেশি ভোটপ্রাপ্ত দুই প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচনের **২১** দিনের কম না পরে অনুষ্ঠিত হতে বাধ্য। রানঅফ রাউন্ডে দুজনের মধ্যে প্রার্থী যারা বৈধ ভোটের ৫০% এর বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান তারা রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হন। নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক ফলাফল নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষণা করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটের দিন হতে সাত দিনের মধ্যে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। 'দ্য

পিপলস মজলিস' মালদ্বীপের সংবিধানে বর্ণিত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করার ক্ষমতা রাখে । এটি ৮৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়। ভোটাররা একজন প্রার্থীকে ভোট দেন। আইনসভাগুলির মধ্যে শূন্যপদগুলি শূন্য হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচনে পূরণ করা হয়। তবে সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাসের মধ্যে কোনো উপ-নির্বাচন নির্ধারিত হবে না।[৪৫]

শ্রীলঙ্কায় নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

শ্রীলঙ্কা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ওয়েস্টমিনিস্টার ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্র নিয়ে যাত্রা করে। ১৯৭৮ সালে সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করে ফরাসি ধরনের কাছাকাছি রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ দেশের পার্লামেন্টের ভোটে যেকোনো নির্বাচনী কেন্দ্রে কোনো দলেরই নির্দিষ্ট প্রার্থী নেই। ব্যালট পেপারে ভোটারদের চিহ্নিত করতে হয় প্রার্থীদের মধ্যে কে তার প্রথম পছন্দ, কে দ্বিতীয়, কে তৃতীয়। দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কাই প্রথম দেশ, যারা সর্ব প্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদানের অধিকার দিয়েছিল। তা ১৯৩১ সাল, ব্রিটিশ আমল। উপমহাদেশের দেশগুলোতে অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার চালু হয় অনেক পরে। শ্রীলঙ্কায় ১৯৭৮ সাল থেকে ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে ওঠেন প্রেসিডেন্টই। তিনি জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হয়ে আসেন পাঁচ বছরের জন্য। এ দেশে পার্লামেন্টেরও আলাদা নির্বাচন হয় পাঁচ বছর অন্তর। বৃহত্তম দল থেকে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের বেছে নেন প্রেসিডেন্ট। শ্রীলঙ্কার পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা ২২৫ জন। তাদের মধ্যে ১৯৬ জন সারা দেশের ২৫টি প্রশাসনিক জেলা থেকে সরাসরি ভোটে জিতে আসেন। বাকি ২৯ জন এমপি মনোনীত হয়ে আসেন- কোন দল কত ভোট পাচ্ছে, সে অনুপাতের ভিত্তিতে। ভোটের প্রক্রিয়া বেশ জটিল। বাংলাদেশে একটি নির্বাচনী কেন্দ্রে কোন দল এক জনকেই প্রার্থী করে। কিন্তু শ্রীলঙ্কায় এক-একটি

জেলাই এক-একটি নির্বাচনী কেন্দ্র। জেলার লোকসংখ্যার ভিত্তিতে ঠিক হয়, সেখানে পার্লামেন্টের কতগুলো আসন থাকবে। শ্রীলঙ্কায় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে নয়, ব্যালট পেপারে ভোট হয়। ব্যালটে থাকে সব দলের নাম ও প্রতীক। আর থাকে পুরো জেলায় প্রতিটি দলের সমস্ত প্রার্থীর নাম। ব্যালটে ভোটারকে প্রথমত নিজের পছন্দের রাজনৈতিক দলটিকে ভোট দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, তার পছন্দের দলের প্রার্থী-তালিকা থেকে বেছে নিতে হয়, সম্ভাব্য এমপি হিসেবে কে কে তার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পছন্দ। অবশ্য নির্দলীয় হয়েও কেউ দাঁড়াতে পারেন। কোনো দল মোট ভোটের পাঁচ শতাংশের কম পেলে গণনার প্রথমেই তারা ছিটকে যায়। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়েও কিন্তু একইভাবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পছন্দ বেছে নেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। সাধারনত ভোটারেরা একজনকেই বেছে নেন। নির্বাচিত হতে গেলে ৫০ শতাংশ ভোট পেতে হয়। দুইয়ের বেশি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী থাকলে ও তাদের কেউই ৫০ শতাংশ ভোট না পেলে তখন প্রথম আর দ্বিতীয় হওয়া প্রার্থীকে নিয়ে ফের নির্বাচন হয়। তবে আজ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার কোনও প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দ্বিতীয় রাউন্ডে যায়নি।[৪৬]

শ্রীলঙ্কার রয়েছে প্রায় ৭০ বছরের অধিককাল নির্বাচন অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা। দেশটির নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থার প্রধান হচ্ছেন কমিশনার অব ইলেকশন। এ ছাড়া রয়েছেন একজন ডেপুটি কমিশনার অব ইলেকশন। রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচন বিভাগের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য নিবন্ধিত হতে হয়। বাংলাদেশের মতো সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্য হতে রিটার্নিং অফিসার ও প্রিসাইডিং অফিসার নিয়োগ করা হয়।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর নির্বাচন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে কিছু পার্থক্য ছাড়া অনেক মিল পাওয়া যায়। অধিকাংশ দেশই এক সময় ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। ফলে পশ্চিমা দেশগুলোকে অনুসরণ করে গণতন্ত্রায়নের পথে এগিয়ে যায়। এখানে এফপিটিপি পদ্ধতি অনুসরণকারী আইনসভাসমূহের চিত্র তুলে ধরা হলো।

সারণি: ২.৮

দক্ষিণ এশিয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভিত্তিক পদ্ধতিতে গঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভাসমূহ

দেশ	আইনসভা/আইনসভার কক্ষ	মোট আসন	সংরক্ষিত আসন	নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক আসন		নির্বাচন পদ্ধতি
				সংরক্ষিত	উন্মুক্ত	
বাংলাদেশ	জাতীয় সংসদ	৩৫০	৫০	০	৩০০	এফপিটিপি
ভারত	লোকসভা (নিম্নকক্ষ)	৫৪৫	০২	১৩১	৪১২	ঐ
মালদ্বীপ	মজলিস	৮৫	০	০	৮৫	ঐ
পাকিস্তান	ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি (নিম্নকক্ষ)	৩৪২	৭০	০	২৭২	ঐ
আফগানিস্তান	হাউজ অব দি এলডারস (উচ্চকক্ষ)	১০২	৩৪	০	৬৮	দুই রাউন্ড রান অফ পদ্ধতি
ভুটান	ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলি (নিম্নকক্ষ)	৪৭	০	০	৪৭	এফপিটিপি
	ন্যাশনাল কাউন্সিল (উচ্চকক্ষ)	২৫	৫	০	২০	ঐ

উৎস: কলিমুল্লাহ, ড. নাজমুল. আহসান এবং চৌধুরী, ড. সাবের. আহমেদ. (সম্পাদিত). (২০২০). *দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র: নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশন*, শিল্পৈষী, ঢাকা, পৃ.৩২৫

সারণি: ২.৯

দক্ষিণ এশিয়ায় পিআর ভিত্তিক পদ্ধতিতে গঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভাসমূহ

দেশ	আইনসভা/আইনসভার কক্ষ	মোট আসন	সংরক্ষিত আসন	নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক আসন		নির্বাচন পদ্ধতি
				সংরক্ষিত	উন্মুক্ত	
শ্রীলঙ্কা	পার্লামেন্ট	২২৫	-	২৯	১৯৬	বিশেষায়িত পদ্ধতি
ভারত	রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ)	২৪৫	১২	-	২৩৩	এসটিভি
পাকিস্তান	সিনেট (উচ্চকক্ষ)	১০৪	-	৩৮	৬৬	ঐ
আফগানিস্তান	হাউজ অব দা পিপল (নিম্নকক্ষ)	২৫০	-	১১	২৩৯	এসএনটিভি

উৎস: কলিমুল্লাহ, ড. নাজমুল. আহসান এবং চৌধুরী, ড. সাবের. আহমেদ. (সম্পাদিত). (২০২০). *দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র: নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশন*, শিল্পৈষী, ঢাকা, পৃ.৩২৭

সারণি: ২.১০

দক্ষিণ এশিয়ায় মিশ্র পদ্ধতিতে গঠিত কেন্দ্রীয় আইনসভাসমূহ

দেশ	আইনসভা/আইনসভার কক্ষ	মোট আসন	সংরক্ষিত আসন	নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক আসন		সংখ্যাগরিষ্ঠতা পদ্ধতি	পিআরভিত্তিক পদ্ধতি
				সংরক্ষিত	উন্মুক্ত		
নেপাল	নিম্নকক্ষ	২৭৫	-	-	২৭৫	১৬৫	১১০
	উচ্চকক্ষ	৫৯	৩	৩৫	২১	১৪	৪২

উৎস: কলিমুল্লাহ, ড. নাজমুল. আহসান এবং চৌধুরী, ড. সাবের. আহমেদ. (সম্পাদিত). (২০২০). *দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র: নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশন*, শিল্পেষী, ঢাকা, পৃ.৩২৮

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জনগনের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতি ও সাংস্কৃতিক অনেক মিল থাকলেও নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশেরই রযেছে নানান অভিজ্ঞতা। কোথাও কিছু মিল আবার কোথাও ভিন্নতাও রয়েছে। তবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবাই গুরুত্ব প্রদান করে। স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, সঠিক ভোটার তালিকা, রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনসহ সকল জনবান্ধব বিষয়গুলো সর্বত্রই গুরুত্ব পায়। ভুটানে সরকারিভাবে দল ও প্রার্থীকে তহবিলের ব্যবস্থা করা এ অঞ্চলে একটি নতুন অভিজ্ঞতা। প্রতিটি দেশেই নির্বাচন ব্যবস্থাতে একটি বড় হুমকি হলো অর্থ ও পেশি শক্তির ব্যবহার। তাই নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গটির মূল লক্ষ্য হলো আমাদের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার মাধ্যমে সরকারকে জনগণের কাছে নিয়ে আসা। যেখানে জনমত ও জনস্বার্থের প্রতিফলন থাকবে। পাশাপাশি সরকারের থাকবে জনগণের প্রতি জবাবদিহিতা।

২.৯ তথ্যপুঞ্জী ঃ

১. চক্রবর্তী, দেবাশিষ. (১৯৯৪). *রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান*, সেন্ট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টার প্রাইজ, কলকাতা, পৃ. ১৭৬

২. Hossain, Mohammad. Sohrab. (2008). Ninth Jatiya Sangsad Election 2008 and Win of Awami League: An Assessment, *Bangladesh Political Science Review*, vol.6, No. 1 , p. 105-118

৩. ঠাকুর, আবদুল. হান্নান. (১৯৯৮). *নির্বাচন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪-৫

৪. হোসেন, এম. সাখাওয়াত. (২০১৪). *বাংলাদেশে নির্বাচনী সংস্কার ১৯৭২-২০০৮*, চৌধুরী, রামেন্দ্র (অনুদিত). প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ.৪৫

৫. প্রাগুক্ত, হোসেন, এম. সাখাওয়াত. পৃ. ৪৫

৬. প্রাগুক্ত, হোসেন, এম. সাখাওয়াত. পৃ. ৪৫-৪৬

৭. প্রাগুক্ত, হোসেন, এম. সাখাওয়াত. পৃ. ৪৭

৮. প্রাগুক্ত, হোসেন, এম. সাখাওয়াত. পৃ. ৪৮

৯. Chowdhury, G.W. (1963). *Democracy in Pakistan*, Social Sciences Research Committee, University of Dacca. p.11

১০. ইসলাম, সৈয়দ. সিরাজুল. (সম্পাদিত). বঙ্গীয় আইন সভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খন্ড, পৃ. ২৯৯

১১. প্রাগুক্ত, ইসলাম, সৈয়দ. সিরাজুল. পৃ. ২৯৯

১২. Banerjee, S.N. (1925). A *Nation in Making*, p. 85-86

১৩. Husain, Shwkat. Ara. (1981). *Politics and sociaty in Bengal 1921-1936: A legislative perspective*, Bangla Academy

১৪. প্রাগুক্ত, ইসলাম, সৈয়দ. সিরাজুল. পৃ. ৩০৩

১৫. প্রাগুক্ত,ইসলাম, সৈয়দ. সিরাজুল. পৃ. ৩০৪

১৬. আহমদ, আবুল. মনসুর. (১৯৭০). *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, পৃ. ৫৫

১৭. রশিদ, হারুন. অর. *বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০১)*, পৃ. ৫৭

১৮. প্রাগুক্ত, আহমদ, আবুল. মনসুর. পৃ. ৫৬

১৯. প্রাগুক্ত, ইসলাম, সৈয়দ. সিরাজুল. পৃ. ৩০৭

২০. Jahan, Rounaq. *Bangladesh Politics: Problems and Issues*, Page IX

২১. Richard L. Park and Richard S. Wheeler, East Bengal Under Governonr Rule. *For Eastern Survey*, 23 (1954), p. 129

২২. আহমেদ, কামাল. উদ্দিন. (১৯৯২). চুয়ান্ন সালের নির্বাচন : স্বায়ত্ব শাসন ১৭০৮-১৯৭১ *এশিয়াটিক সোসাইটি* ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৬৯

২৩. Chowdhury, G.W. (1963). *Democracy in Pakistan*, Dacca, p.56-57

২৪. হক, ড. আবুল. ফজল. (১৯৯৫). *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, রংপুর, পৃ. ১-২

২৫. Holiday, 14 June, 1970

২৬. Maniruzzaman, Talukdar. (1975). *Redical Politics and Emergence of Bangladesh*, Bangladesh books International, p. 41.

২৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা, ২০১৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত পৃ. ৪৩

২৮. প্রাগুক্ত, হোসেন, এম. সাখাওয়াত. পৃ. ৪৯।

২৯. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃষ্ঠা ৪

৩০. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃষ্ঠা ৪২

৩১. প্রাগুক্ত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃষ্ঠা ৪৪

৩২. বাংলাপিডিয়া

৩৩. বাংলাপিডিয়া

৩৪. গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ (বাংলাদেশ গ্যাজেট, জুলাই ১, ২০২১)

৩৫. রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী আচরণ বিধিমালা ২০২৫

৩৬. প্রাগুক্ত, হোসেন, এম. সাখাওয়াত. পৃ. ১১১-১১২

৩৭. রায়, অরুন্ধতী. (২০১৯). ভারতের নির্বাচন নিয়ে অরুন্ধতী রায়ের সংঙ্গে সংলাপ, *সর্বজনকথা*,আগস্ট-অক্টোবর,২০১৯

https://sarbojonkotha.info/wpcontent/uploads/2020/03/sk-20-varoter-nirbachon.pdf

৩৮. দৈনিক ইত্তেফাক, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪;

https://www.ittefaq.com.bd/677163

৩৯. প্রাগুক্ত, হোসেন, এম. সাখাওয়াত. পৃ ২০৭-২১০

৪০. আলি, আকবর. *পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যবস্থা 'অনুসরণ করা যেতে পারে'*, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article2044036.bdnews

৪১. প্রাগুক্ত, হোসেন, এম. সাখাওয়াত. পৃ. ২০৫-২০৬

৪২. প্রাগুক্ত, হোসেন, এম. সাখাওয়াত. পৃ. ১০৭।

৪৩. The Constitution of The Kingdom of Bhutan, 2008

৪৪. মজুমদার, ড. এম আবুল কাশেম এবং ইসলাম, মুহাম্মদ মুজাহিদুল, *ভুটানের নির্বাচন কমিশন: নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের অধীনে অভিনব নির্বাচন*. কলিমউল্লাহ, ড. নাজমুল. আহসান ও চৌধুরী, ড. সাবের আহমেদ. (সম্পাদিত). দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশন, শিল্পৈষী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭৯-৮১

৪৫. https://bn.wikipedia.org/wiki

৪৬. নয়া দিগন্ত, ২৭ আগস্ট ২০২৪;

https://www.dailynayadiganta.com/subcontinent/837844

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭২-১৯৯০)

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭২-১৯৯০)

একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে আমাদের দেশ যাত্রা শুরু করে। ১৯৭২ সালের স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রই ছিল মূখ্য। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান পাশ হয় এবং তা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। সংবিধানের সপ্তম ভাগে নির্বাচন ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ উপস্থাপিত হয়েছে এবং এ সংবিধানের আলোকেই বাংলাদেশে সকল নির্বাচনী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অংশ। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"[১] এখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ শাসন করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যাপারটি শাসনতান্ত্রিক ভাবেই এসেছে। তাই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত হবে। এ পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশের কয়েকটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৩.১ সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৩

বাংলাদেশের প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ। এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায়। ১৯৭৩ সালে ২৮৯ টি আসনে নির্বাচন হয়। বাকি আসনের প্রার্থীরা নির্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হয়ে সরকার গঠন করে।

সারনি: ৩.১

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল, ১৯৭৩

দল	মোট আসন প্রতিদ্বন্দিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত মোট
আওয়ামী লীগ	২৯২	২৯২ (৯৭.৫৮)	৭৩.২০	১৩৭৯৩৭১৭
ন্যাপ (মোজাফফর)	২২৪	০১ (০.৩৫)	৮.৩৩	১৫৬৯২৯৯
জাসদ	২৩৭	০১ (০.৩৫)	৬.৫২	১২২৯১১০
ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	০১ (০.৩৫)	৫.৩২	১০০২৭৭১
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	০৮	০১ (০.৩৫)	০.৩৩	৬২৩৫৪
বাংলা জাতীয় লীগ	১১	-	০.২৮	৫৩০৯৭
সিপিবি	০৪	-	০.২৫	৪৭২১১
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	০৩	-	০.২০	৩৮৪২১
কমিউনিস্ট পার্টি(লেলিনবাদী)	০২	-	০.১০	১৮৬১৯
বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	০৩	-	০.০৬	১১৯১১
বাংলা জাতীয় কংগ্রেস	০৩	-	০.০২	৩৭৬১
জাতীয় শ্রমিক দল	০১	-	০.০১	১৮১৮
স্বতন্ত্র	১২০	০৪ (১.৭৩)	৫.২৫	৯৮৯৮৮৪
মোট	১০৭৮	৩০০	১০০	১৮৮৪৬৮০৮

ব্রাকেটে প্রাপ্ত আসনের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন ১৯৭৩

আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় কাংখিত ছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত মর্যাদা ছিলো ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে। তাঁর জনপ্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ করার মত কেউ ছিল না। অন্য দিকে বিরোধী দলগুলো বেতার, টেলিভিশন, পত্র পত্রিকায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। ভোটারদের জন্যে সত্যিকারের কোন বিকল্প ছিল না। অন্যান্য দলেও বিশেষ করে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলে, নিবেদিত কর্মী অনেক আছেন কিন্তু জাতীয় পর্যায়ের নেতা বলতে কেউ নেই।[২] ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর ১৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধানমন্ত্রিত্বে ২১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যদের শতকরা ৪৩

ভাগ এর পূর্ব অভিজ্ঞতার কমতি ছিল।[৩] তারপরও তিনি দেশ গঠনে তৎপর ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের সূচনা হয়। এরপর চলতে থাকে একের পর এক অভ্যুত্থান, ব্যর্থ অভ্যুত্থান এবং পাল্টা অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা, স্বাধীন বাংলাদেশে নির্বাচন হয়ে পরে অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ।

৩.২ সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৭৯

বাংলাদেশে দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৯ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায়, আর দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায়।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি সায়েম। ১৯৭৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত জিয়াউর রহমান ছিলেন অন্যতম উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, যদিও কার্যত তিনিই ছিলেন প্রধান। ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ থেকে অব্যাহতি নেন এবং জিয়াউর রহমান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল যখন রাষ্ট্রপতি সায়েম স্বাস্থ্যগত কারণে রাষ্ট্রপতির পদ হতে পদত্যাগ করেন তখন জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। জিয়া সরকার ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই এক নতুন রাজনৈতিক দল বিধি প্রণয়ন করেন এবং বিধি সাপেক্ষে রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক ক্রিয়ালাপের অনুমতি দেয়া হয়।

১৯৭৮ সালের ৩ জুন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন ৬টি দলের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী। নির্বাচনের পর এই ফ্রন্টকে তিনি

রাজনৈতিক দলে রূপান্তর করতে চান। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বয়ং এই দলের আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সামরিক শাসনের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক দল ও উপদল অংশ গ্রহণ করেন। নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ২০৭টি আসন পায়। দলটি প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪১.১৭ ভাগ ভোট পায়। আওয়ামী লীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ওই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন। এক ভাগের নেতৃত্ব দেন আব্দুল মালেক উকিল ও অপর ভাগ মিজানুর রহমান চৌধুরী। নির্বাচনে মালেক গ্রুপ পায় ৩৯টি আসন (শতকরা ২৪ দশমিক ৫৬ ভাগ ভোট) আর মিজান গ্রুপ পান মাত্র ১টি আসন (শতকরা ২ দশমিক ৭৮ ভাগ ভোট)।

সারণি: ৩.২
জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ১৯৭৯

দল	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট
বিএনপি	২৯৮	২০৭ (৬৯)	৪১.১৭	৭৯৩৪২৩৬
আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৫	৩৯ (১৩)	২৪.৫৬	৪৭৩৪২৭৭
আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৪	২ (০.৬৬)	২.৭৮	৫৩৫৪২৬
মুসলিম লীগ আইডিএল	২৬৬	২০ (৬.৬৬)	১০.০৭	১৯৪১৩৯৪
জাসদ	২৪০	৮ (২.৬৬)	৪.৮৩	৯৩১৮৫১
ন্যাপ (মোজাফফর)	৮৯	১ (০.৩৩)	২.২৪	৪৩২৫১৪
বাংলাদেশ গণফ্রন্ট	৪৬	২ (০.৬৬)	০.৬০	১১৫৬২২
বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল	২০	১ (০.৩৩)	০.৩৯	৭৪৭৭১
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১৩	২ (০.৬৬)	০.৩৬	৬৯৩১৯
বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি	৫	১ (০.৩৩)	০.১৮	৩৪২৫৯)
জাতীয় একতা পার্টি	৫	১ (০.৩৩)	০.২৩	৪৪৪৫৯
স্বতন্ত্র	৪.২২	১৬ (৫.৩৩)	১০.১৯	১৯৫৩৩৪৫

ব্রাকেটে প্রাপ্ত আসনের শতকরা হার দেখা হয়েছে।

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন, দেখুন Al Masud Hassanuzzaman, Role Opposistion in Bangladesh Politics, Dhaka, 1998.

১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কতিপয় বিদ্রোহী অফিসার কর্তৃক প্রেসিডেন্ট লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিহত হন। পরবর্তিতে বাংলাদেশের রাজনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থা আবারো থমকে যায়।

৩.৩ সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৮৬

২৪ মার্চ ১৯৮২, রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন।[৪] ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার লক্ষ্যে সামরিক বাহিনীকে তিনি নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন। সংবিধান স্থগিত, সংসদ বাতিল ও মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। অভ্যুত্থানের সময় থেকেই জেনারেল এরশাদের লক্ষ্য ছিল যে কোন উপায়েই হোক রাষ্ট্রপ্রধান পদে নির্বাচিত হওয়া।[৫] এ উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালের শেষে তিনি ‘জনদল’ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। কিন্তু তিনি নিজে এ দলে যোগ দেননি। পরবর্তীতে এ দলই হয় জাতীয় পার্টি এবং তিনি এ দলে যোগ দেন। জেনারেল এরশাদ ১৯৮৫ সালের প্রথম দিকে উপজেলাগুলাতে নির্বাচন করেন। জেলাগুলোতে একজন করে গর্ভনর নিয়োগ দেন। সংসদ নির্বাচন করার আগে উপজেলা নির্বাচন করায় সকলেই হতাশ হয়েছিলেন।

১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন হল। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকে নবগঠিত জাতীয় পার্টি ছাড়া অন্য সবগুলা দল নির্বাচন বর্জন করার ব্যাপারে মোটামুটি একমত ছিল। ১৯ এপ্রিল সে মর্মে তারা আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও দেয়। কিন্তু ২১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে যে তারা সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে।[৬] বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট ও ৫ দলীয় বাম জোট এ নির্বাচন বয়কট করে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি পেয়েছিল ১৫৩ টি আসন, প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪২ দশমিক ৩৪ ভাগ ভোট। অন্য

দিকে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ৭৬টি আসন। ভোট পেয়েছিল ২৬.১৬ ভাগ। এর বাইরে জামায়াত ১০টি, সিপিবি ৫টি, ন্যাপ (মোজাফফর) ২টি, ন্যাপ (ভাসানী) ৫টি, বাকশাল ৩টি, জাসদ (রব) ৪টি, জাসদ (সিরাজ) ৩টি, মুসলীম লীগ ৪টি, ওয়াকার্স পার্টি ৩টি ও স্বতন্ত্ররা ৩২টি আসন পেয়েছিল।

সারণি: ৩.৩

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ১৯৮৬

দল	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত আসনের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোটেরশতকরা হার
জাতীয় পার্টি	১৫৩	৫১.০১	৪২.৩৪
আওয়ামী লীগ	৭৬	২৬.১৫	২৬.১৬
জামায়াতে ইসলামী	১০	৩.৩৩	৪.৬৯
ন্যাপ (যুক্ত)	৫	১.৬৬	১.২৯
সিপিবি	৫	১.৬৬	০.৯১
জাসদ (রব)	৪	১.৩৩	২.৫৪
মুসলিম লীগ	৪	১.৩৩	১.৪৫
জাসদ (সিরাজ)	৩	১.০০	০.৮৭
রাকশাল	৩	১.০০	০.৬৭
ওয়াকার্স পার্টি	৩	১.০০	০.৫৩
ন্যাপ (মোজফফর)	২	০.৬৬	০.৭১
অন্যান্য	-	-	১.৭৩
স্বতন্ত্র	৩২	১০.৬৬	১৬১৯
মোট	৩০০	১০০.০০	১০০.০০

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন, ১৯৮৬

লর্ড ডেভিড এনালসের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক দল ১৯৮৬ সালের মে মাসের সংসদ নির্বাচন দেখতে এসেছিলেন। সে নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতা, ভীতি প্রদর্শন, জাল ভোট প্রদান, ব্যালট বাক্স চুরি ইত্যাদি বহু দুর্নীতি হয়েছে বলে সে পর্যবেক্ষক দল অভিযোগ করেন।[৭] এ নির্বাচন ছিল ভোটার বিহীন নির্বাচন। দেশি, বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস কারচুপির অভিযোগ করেন এবং এর জন্য

প্রধানত সরকারি দলকেই দায়ী করা হয়। নির্বাচনী হাঙ্গামায় সারাদেশে অন্তত ১৫ জন নিহত ও আহত হন ৭ শতাধিক ব্যক্তি[৮] ।

১৭ জুন ১৯৮৬ সালে সংবিধানকে আংশিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করে রাষ্ট্রপতি সংবিধানে ২নং অনুচ্ছেদের ১নং আদেশ মোতাবেক ১০ জুলাই নবনির্বাচিত সংসদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। বিএনপির চেয়ারম্যান বেগম খালেদা জিয়া সামরিক আইন বহাল অবস্থায় সংসদের অস্তিত্ব গণতন্ত্র বিরোধী বলে বক্তব্য করেন। ৮ দল, ৭দল ও ৫ দল সংসদ অধিবেশনকে কেন্দ্র করে যুগপৎ কর্মসূচী ঘোষণা করে এবং বেগম খালেদা জিয়া এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

৩.৪ সংসদ নির্বাচন: ১৯৮৮

১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যবদ্ধ ভাবে না হলেও যুগপৎ এরশাদ সরকারের উৎখাতের জন্য আন্দোলন শুরু করে। ব্যাপক হরতাল, অবরোধ এবং সরকারের প্রতিরোধ কর্মসূচীতে রাষ্ট্র এক চরম সংকটে উপনীত হয়। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়াকে অন্তরীন করা হয়। ১৯৮৭ সালের ২৭ নভেম্বর জেনারেল হুসেনই মুহাম্মদ এরশাদ দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। এ ঘোষণায় সব ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়। ৬ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ তৃতীয় জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং যথা শীঘ্র নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন বলে আশ্বাস দেন। শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়াসহ অপর ১৭ জন কারাবন্দী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি লাভ করে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে, জনগণের এক দফা আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এবং প্রেসিডেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদকে পদত্যাগ করতেই হবে। এর পাশাপাশি তাঁরা নির্দলীয় নিরপেক্ষ

সরকারের অধীনে অবাধ নির্বাচনের দাবিতে অটল থাকেন। ৮ দল, ৭দল ও ৫ দলের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ও কর্মসূচী অব্যাহত রাখা হয়।

সারণি: ৩.৪

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঃ ১৯৮৮

দল	মোট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
জাতীয় পার্টি	২৮০	২৫১	৮৩.৬৬
কপ*	২৬৮	১৯	৬.৩৩
জাসদ (সিরাজ)	২৪	৩	১.০০
ফ্রীডম পার্টি	১১১	২	০.৬৬
অন্যান্য দল	৫৯	০	০
স্বতন্ত্র	২১৩	২৫	৮.৩৩
মোট	৯৫৫	৩০০	১০০.০০

সূত্র ঃ নির্বাচন কমিশন

*কপ বা Combind Opposition Parties

বিরোধী দলের মনোভাব জেনেও জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের ঘোষণা অনুযায়ী ইতোমধ্যে নির্বাচন কমিশন ১৯৮৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করে। আন্দোলনরত সকল জোট ও দল এই ঘেষাণা প্রত্যাখ্যান করে এবং নির্বাচন বাতিলের ডাক দেয়। এরশাদ আগের মত প্রসহনমূলক নির্বাচনের দিকে ধাবিত হয়। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ নির্ধারণ করে। পাশাপাশি ১৯৮৮ সালের ২৫ জানুয়ারি সরকার এক নতুন আদেশ জারির মাধ্যমে সকল প্রকার নির্বাচন বিরোধী তৎপরতা নিষিদ্ধ করে। এরশাদ পুনরায় আরেকটি ভোটার এবং প্রতিযোগিতা বিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন সম্পন্ন করে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ঐ নির্বাচন বয়কট করে। এ নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জাতীয় পার্টি ও

জেনারেল এরশাদ সমর্থক কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (সিরাজ) ও ফ্রিডম পার্টিসহ ৮টি দল অংশ গ্রহণ করে। মুলত এসব দলকে নানা ধরনের সুবিধা দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানো হয়। প্রহসনের এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি তিন চতুর্থাংশেরও বেশি আসনে জয় লাভ করে বলে সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হয়। বিরোধী দল এ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলো বৈধতার প্রশ্নে সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। নির্বাচনী দুর্নীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতাও জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের তেমন কোন প্রচেষ্টা এ সময়ে লক্ষ্যণীয় হয়নি। নির্বাচনী সহিংসতা ও দুর্নীতির মাত্রা বাড়তে থাকে। ফলে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়া এ অবস্থা থেকে দেশকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে ।

৩.৫ তথ্যপুঞ্জী

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ২০১৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত পৃ.৪

২. রহমান, সিরাজুর. (২০০২). *ইতিহাস কথা কয় ও নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, শিকড়, পৃ.৩১

৩. Banu, UAB Razia Akter. (1981). The Fall of Sheikh Mujib Regime An Analysis. *The IndianPolitical Science Review***.** Vol –XV, N0-1 Januaryn1981 P-9

৪. কায়সার, আশরাফ. (১৯৯৮). *বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকান্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ.১১০

৫. রহমান, সিরাজুর. *ইতিহাস কথা কয় ও নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, পৃ.১১৬

৬. প্রাগুক্ত, রহমান, সিরাজুর, পৃ-১৬৬

৭. প্রাগুপ্ত, রহমান, সিরাজুর পৃ-১১৭

৮. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৫ বর্ষ, ১ সংখ্যা, ১৬ মে, ১৯৮৬

চতুর্থ অধ্যায়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন

চতুর্থ অধ্যায়

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন

৪.১ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ

বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের প্রতি একধরনের আস্থাহীনতায় ভোগে। তাই অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক প্রকারের শাসন ব্যবস্থা, যেখানে দুইটি নির্বাচিত সরকারের মধ্যবর্তী সময় কালে সাময়িক ভাবে অনির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ কোন দেশের শাসনভার গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ একটি সরকারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় থেকে নতুন একটি সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ববর্তী সময়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিত থাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এ সরকার দৈনন্দিন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে এবং নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকে। সাধারণত নির্বাচন পরিচালনাই এ সরকারের প্রধান কাজ।[১]

৪.২ তিন জোটের রূপরেখা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ

১৯৮১ সাল থেকে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু। ৯০-এর এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ১৫ দলের, ৭ দলের ও ৫ দলের সমন্বয়ে গঠিত তিন জোটের নেতৃত্বে একটি গণজাগরণ সৃষ্টি হয়। এ আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক আন্দোলনের তিন জোটের যে ঐতিহাসিক রূপরেখা প্রণীত হয়েছিল সেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা পাওয়া যায়। তিন জোটের রূপরেখায় ১০টি বিষয় অন্তর্ভূক্ত ছিল, সেগুলো বিভক্ত ছিল চারটি ভাগে। প্রতিশ্রুতিগুলো হলো ঃ[২]

(১) হত্যা, কুচক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের ধারায় প্রতিষ্ঠিত স্বৈরাচারী এরশাদ ও তার সরকারের শাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ঃ

(ক) সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে এরশাদ ও তার সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করে স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনরত তিন জোটের নিকট গ্রহণযোগ্য একজন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করবেন। বর্তমান সরকার ও সংসদ বাতিল করে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করে উক্ত উপরাষ্ট্রপতির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

(খ) এ পদ্ধতিতে উক্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, যার মূল দায়িত্ব হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

(২) (ক) তত্ত্ববধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সাথে যুক্ত হবেন না।

(খ) অন্তর্বর্তীকালীন এ সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করবেন।

(গ) ভোটারগণ যাতে করে নিজ ইচ্ছা ও বিবেক অনুযায়ী প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সে ব্যবস্থা পুনঃস্থাপন এবং তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(ঘ) গণপ্রচার মাধ্যমকে পরিপূর্ণভাবে নিরপেক্ষ রাখার উদ্দেশ্যে রেডিও টেলিভিশনসহ সকল রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমকে স্বাধীন ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে হবে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল রাজনৈতিক দলের প্রচার প্রচারণার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম সংসদের নিকট অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন এবং এ সংসদের নিকট সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

(৪) (ক) জনগণের স্বার্বভৌমত্বের স্বীকৃতির ভিত্তিতে দেশে সাংবিধানিক শাসনের ধারা নিরঙ্কুশ ও অব্যাহত রাখা হবে। অসাংবিধানিক যে কোন পন্থায় ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করা হবে। নির্বাচন ব্যতীত অসাংবিধানিক বা সংবিধানবহির্ভূত কোন পন্থায়, কোন অজুহাতেই নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে না।

(খ) জনগনের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করা হবে।

(গ) মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী সকল আইন বাতিল করা হবে।

৪.৩ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ১৯৯১ এর নির্বাচন ঃ

প্রেসিডেন্ট এরশাদের নয় বছর স্থায়ী স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে টানা আন্দোলনের শেষভাগে সারা দেশে হরতাল, বিক্ষোভ, প্রতিরোধ আর প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে। এরশাদ সরকারও এই আন্দোলন দমনের জন্য সব রকম চেষ্টা চালায় এবং অনিবার্য রক্তপাত ঘটতে থাকে দেশজুড়ে। এই অবস্থায় শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি ফর্মুলা নির্ধারণ করে তিন জোটের রূপরেখা ঘোষণা হয়। আন্দোলন তীব্র আকার ধারন করে।[৩] এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর পদত্যাগ ও তিন জোটের মনোনীত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। তিন জোটের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদকে প্রেসিডেন্ট এরশাদ উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করে তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এ সরকারের অধীনে ৯১-এর ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১৪৬টির বেশি আসন পেয়ে জামায়াতের সমর্থনে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। মার্চে বেগম

খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করে এবং রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৫ মার্চ তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ বিলোপ ঘোষণা করেন।[৪]

বহু আকাঙ্ক্ষিত এ নির্বাচন যুগপৎ জনগণ ও রাজনৈতিক দল সমূহর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে এবং এ নির্বাচনেই পূর্ববর্তী অন্যান্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ৭৬টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে।[৫] সারা দেশের ২৪ হাজার ২শ ভোট কেন্দ্রের মধ্যে নির্বাচন কমিশন, প্রিসাইডিং অফিসারদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হওয়ার কারণে চারটি আসনের ২১টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করে পুননির্বাচনের ব্যবস্থা করে। বিক্ষিপ্ত নির্বাচনী সংঘর্ষে সারা দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্মথক ও কর্মী আহত ও গ্রেফতার হয়েছে।[৬]

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশী পর্যবেক্ষক দল ১৯৯১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসেন। এ সকল পর্যবেক্ষকগণ এ নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অত্যন্ত সফল বলে স্বীকৃতি দেন।[৭] যে সকল কারণে নির্বাচনটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে সরকারি দলের অনুপস্থিতি, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ও নির্বাচন কমিশনের স্বায়ত্বশাসন ও প্রচুর ক্ষমতা প্রাপ্তী ছিল উল্লেখযোগ্য।[৮]

জনগণ আশা করেছিল সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গণতন্ত্রকে লালন পালন করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে। কিন্তু ১৯৯১ পরবর্তী নির্বাচিত সরকার তিন জোটের পক্ষ থেকে যে অভিন্ন রূপরেখা ঘোষণা করা হয় তার ব্যাপারে মনোযোগ দেয়নি। এটি সুস্পষ্ট যে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার গণদাবির কাছে নতি স্বীকার করেছে এবং তিন দলীয় জোটের সব দাবি মেনে নিয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারও কথা রেখেছিল। কিন্তু পরবর্তী নির্বাচিত সরকারগুলোর প্রতিশ্রুতি ছিল প্রশ্নবিদ্ধ।[৯]

৪.৪ সাংবিধানিক প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ও ১২ জুন, ১৯৯৬ এর নির্বাচন

বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত ১৯৯৬ সালের সরকার হচ্ছে সাংবিধানিকভাবে প্রথম তত্ত্বধায়ক সরকার। আর ঐতিহাসিকভাবে সে ক্ষেত্রে প্রথম হওয়ার দাবিদার ১৯৯০ সালে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত সরকার। এটি গঠিত হয় এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তিন জোটের রূপরেখা অনুসারে। দুই তত্ত্বাবধায়ক সরকারই গঠিত হয় সুদীর্ঘ এবং রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের মাধ্যমে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সবচেয়ে বেশি আসন পেয়ে সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপির অভিযোগ আনেন। তবে তিনি এ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়ে শপথ গ্রহণ করেন। সেই থেকে পঞ্চম সংসদের যাত্রা শুরু। বিএনপি সরকার গঠন করার কিছু দিন পর থেকেই বিরোধী দলগুলো সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংযোজনের জন্য সরকারকে চাপ দিতে থাকে।[১০]

১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকারের আমলে প্রথম উপ নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা-১১ আসনে। এতে সরকারি দল জয়ী হয়। ভোট কারচুপির অভিযোগ এনে আওয়ামী লীগ ১৬ কেন্দ্রের পুনঃনির্বাচন দাবি করে। কারচুপির প্রতিবাদে তারা ৬ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালন করে।[১১] রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে তত্ত্বাবধয়ক সরকারের দাবিতে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের সূচনা এখানেই। মাগুরা-২ আসনের সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আসাদুজ্জামান মারা যাওয়াতে ঐ সময়ে সেখানে চলছিল উপনির্বাচনের কর্মকান্ড। উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ২০ মার্চ সেখানে উপনির্বাচন হয়। নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী কাজী সলিমুল হক কামালকে বেসরকারিভাবে

বিজয়ী ঘোষণা করা হলো। এরই প্রেক্ষাপটে শুরু হল লাগাতার সংসদ অধিবেশন বর্জন ও অন্য দিকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবিতে আন্দোলন।

১৯৯৪ সালের ২৭ জুন সংসদ ভবনে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ, জামায়াত তত্ত্বধায়ক সরকারের রূপরেখা ঘোষণা করে।[১২] ১৯৯৪ সালের ১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মানিক মিয়া এভিনিউতে এক জনসভায় ঘোষণা করেন, বিরোধী দলের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি অসাংবিধানিক। তত্ত্বধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনে অজস্র হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও মিছিল সমাবেশ, পদযাত্রা, রেল যাত্রা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব কর্মসূচী অনেক ক্ষেত্রেই ছিল সহিংস ও রক্তক্ষয়ী । কমনওয়েলথ মহাসচিব, সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর নভেম্বরে কমনওয়েলথ মহাসচিবের প্রতিনিধি স্যার নিনিয়ান সমঝোতা প্রচেস্টা চালান। তিনিও ব্যর্থ হন।[১৩] ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৪ আওয়ামী লীগ, জামায়াত আলাদা সমাবেশ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেয়। সরকার তার অবস্থানে অনড় থাকায় ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ পত্র পেশ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারী স্পিকার তাদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণযোগ্য নয় বলে রুলিং দেন। ১৯৯৫ সালের ১৯ জুন বিরোধী সংসদ সদস্যদের পর পর ৯০ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিতি পূর্ণ হয়। এতে সংসদে তাদের আসন শূন্য হবে কিনা এ নিয়ে বিতর্কে সরকারি দল ও স্পিকারের মাঝে দ্বিমত দেখা দেয়। এ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক পদত্যাগী সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হবে কিনা জানতে চেয়ে সুপ্রীম কোর্টের নিকট পরামর্শ চান। সুপ্রীম কোর্ট পদত্যাগী সংসদ সদস্যদের আসন শূণ্য হওয়ার পক্ষে মত দেন। ৩১ জুলাই ১৯৯৫ সংসদ সচিবালয় থেকে ৮৭ জন বিরোধী সংসদ সদস্যের আসন শূন্য বলে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া যে ৫৫ জন বয়কটকালে হাজিরা খাতায় সই করেছিলেন তাদের সংসদ সচিবালয় থেকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়, সেদিন তারা হাজিরা খাতায় সই করেছিলেন সেদিন

বৈঠকে তারা উপস্থিত ছিলেন কিনা। সংসদ সদস্যরা এ চিঠির কোন উত্তর দেননি। অবশেষে ৭ আগস্ট ঐ ৫৫ জনের আসনও শূন্য ঘোষণা করা হয়। নির্বাচন কমিশন ১৪২টি আসনে ১৭ সেপ্টেম্বর উপনির্বাচন ঘোষণা দেয়। বন্যার কারণে উপনির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে ১৫ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়। কিন্তু বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। তারা সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ২ সেপ্টেম্বর থেকে টানা ৩২ ঘন্টা হরতাল পালন করে। ৬ সেপ্টেম্বর শেখ হাসিনা আবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন।[১৪] তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রধানমন্ত্রী অসাংবিধানিক অযৌক্তিক বলে বাতিল করে দেন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলগুলোকে আলোচনার জন্য ডাকেন। কিন্তু বিরোধী দলগুলো আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। এরপর ১৬ নভেম্বর ১৯৯৫ থেকে একধারে ৭ দিন হরতাল পালন হয়। বাংলাদেশে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেখা দেয় এক বিপর্যয়। শুধুমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারকে কেন্দ্র করে এ অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। হরতাল অবরোধের ফলে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বেশ দূরবস্থার মুখোমুখি হয়। সরকার উপনির্বাচনে না গিয়ে ২৪ নভেম্বর জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। ১৮ জানুয়ারি ১৯৯৬ সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। পরে তৃতীয়বারের মত তারিখ পরিবর্তন করে নতুন তারিখ হয় ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি।

নির্বাচন ব্যবস্থার উপর আস্থা না থাকা ও সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সব বিরোধী দল এ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধের মুখে ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী সহিংসতায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়। সমগ্র দেশ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলায় নিপাতিত হয়। ২৪, ২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলের আহ্বানে দেশব্যাপী অসহযোগ পালিত হয়। ৬ মার্চ হরতালের মধ্যে সিরাজগঞ্জ-৩ আসনে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সহিংসতায় ৯ জন নিহত হয়।

বিরোধী দলগুলোর লাগাতার অসহযোগ আন্দোলনের মাঝেই ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। সারাদেশে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। এর মধ্যে আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। ফলে আন্দোলন এক নতুন মাত্রা লাভ করে। সরকার ২১ মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে উত্থাপন করে। ২৬ মার্চ সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল জাতীয় সংসদে পাশ হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরার্মশক্রমে ৩০ মার্চ রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ সংসদ ভেঙ্গে দেয় এবং বেগম খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। বিচারপতি মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

তত্ত্ববধায়ক সরকার বিল পাশঃ

অসহযোগের মাঝেই ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। কিন্তু সারা দেশে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা শুরু হলে সরকার ২১ মার্চ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল সংসদে উত্থাপন করে। ২৬ মার্চ সরকার নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল জাতীয় সংসদে পাশ হয়। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ৩০ মার্চ রাষ্ট্রপতি ষষ্ঠ সংসদ ভেঙ্গে দেয় এবং খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।

সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন ১৯৯৬ঃ[১৫]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবলিত বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন আইন ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন ২৬৮-০ ভোটে পাশ হয়। ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভের পর এটি আইনে পরিণত হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে চতুর্থ “২ক পরিচ্ছদ; নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার” নামে নতুন পরিচ্ছেদ যোগ হয়। এতে ৫৮ক, ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ ও ৫৮ঙ নামে নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত

হয়। এছাড়া সংবিধানের ৬১, ৯৯, ১২৩, ১৫৭, ১৫২ অনুচ্ছেদসহ তৃতীয় তফসিলের বিধান সংশোধন করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সদস্যদের যোগ্যতা ও কার্যাবলী ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংশোধনী অনুযায়ী দু'ভাগে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়

১. কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হলে সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার ১৫ দিনের মধ্যে।

২. মেয়াদ অবসানের কারণ- সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার ১৫ দিনের মাধ্যে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠনঃ

৫৮গ অনুচ্ছেদ অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১১ সদস্যের বেশি হবে না। এর মধ্যে একজন প্রধান উপদেষ্টা ১০ উপদেষ্টা থাকবেন।

উপদেষ্টা হওয়ার যোগ্যতাঃ

১. সংসদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে।

২. তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোন সংগঠনের সদস্য হবেন না।

৩. আসন্ন সংসদ নির্বাচন প্রার্থী নহেন বা প্রার্থী হবেন না এ মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হয়েছেন।

৪. ৭২ বছরর অধিক বয়স্ক নহেন।

প্রধান উপদেষ্টা কাকে নিয়োগ দেয়া যাবেঃ

১. বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন।

২. যদি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি যদি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান তাহলে তার অব্যাবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে।

৩. যদি কোন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে পাওয়া না যায় অথবা তিনি যদি প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণে অসম্মতি জানান তাহলে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণের মধ্যে যিনি সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন।

৪. যদি আপিল বিভাগের কোনো অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে না পাওয়া যায় অথবা তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ নিতে অসম্মতি জানান তাহলে প্রেসিডেন্ট প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে কোনো ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ দেবেন।

৫. উপরোক্ত কাউকে না পাওয়া গেলে প্রেসিডেন্ট তার স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।

পদমর্যাদা ও কার্যাবলীঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা এবং উপদেষ্টাগণ মন্ত্রীর পদমর্যাদা এবং পারিশ্রমিক ও সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

কার্যাবলী ঃ

১. দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন ছাড়া তত্ত্ববধায়ক সরকার কোনো নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না।

২. শান্তিপূর্ণ, ষুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এই সরকার নির্বাচন কমিশনকে সার্বিক সাহায্য করবে।

দায়িত্ব গ্রহণ করেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান মুহম্মদ হাবিবুর রহমান তাঁর উপদেষ্টা পরিষদকে নিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সচেষ্ট হন। দেশে কিছুটা স্থিতিশলীতা ফিরে আসে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মোট ১৪৬টি আসনে জয়লাভ করে তারা জাতীয়

পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। বিএনপি মোট ১১৬টি আসন পেয়ে বৃহৎ বিরোধী দলের রেকর্ড অর্জন করে।

বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারকে কেন্দ্র করে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান হয়। তার পরও নির্বাচনী বিরোধ রয়েই যায়। বাংলাদেশের মানুষ একটি স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জন্য আশায় বুক বাঁধে।

৪.৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও ২০০১ সালের নির্বাচনঃ

১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং জাতীয় ঐক্যমতের সরকার গঠন করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকারের মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হয় ১৬ জুলাই ২০০১ এবং ১৪ জুলাই রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দেন। সংবিধানের ৫৮ (গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোঃ লতিফুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। উদ্দেশ্য বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি ১৬ জুলাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। উপদেষ্টা পরিষদের শপথ গ্রহণের ১ ঘন্টার মধ্যে ১৩ জন সচিবকে বদলির নির্দেশ দেন।[১৬]

তত্ত্বাবধায়ক সরকার জনপ্রশাসনের নিরপেক্ষতা অর্জনের জন্য ২৮ জন সচিব, ১৯ জন অতিরিক্ত সচিব, ৪৫ জন যুগ্ম সচিব, ৭৭ জন উপ-সচিব, ৫৬ জন সহকারি সচিব, বিভাগীয় কমিশনার ও এসপি এবং ৪৬৪ ওসিকে বদলি করে।[১৭]

নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সরকার নির্বাচনী আইন সংশোধন করে। সংশোধিত জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ২০০১ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনী বিধি প্রণয়নের জন্য ক্ষমতা দেয়া হয়। এ অধ্যাদেশে নির্বাচনী কারচুপি সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির দায়িত্ব নির্বাচন ট্রাইবুনালের পরিবর্তে হাইকোর্ট বিভাগের

অধীন করা হয়।[১৮] তত্ত্বাবধায়ক সরকার সারা দেশে পুলিশ, বিডিআর-এর সহযোগিতায় অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চালায়। ২৮ জুলাই ২০০১ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত মোট ৫,৪৮১টি অস্ত্র উদ্ধার করে এবং ১২৪,২২০ জন অপরাধীকে গ্রেফতার করে।[১৯] নির্বাচনের পূর্বে অবস্থা বিবেচনা করে সরকার সারাদেশে মোট ১৩০০০ ভোট কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এস.এ সাঈদ ২০০১ সালের ১ অক্টোবর সোমবার অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেন। ঘোষণা অনুযায়ী কক্সবাজারে একটি আসনের একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে ৩০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদের মধ্যে ২৯৯টি আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মোট ৫৪টি দল থেকে স্বতন্ত্রসহ মোট ১৯৩৯ জন প্রার্থী অংশ গ্রহণ করেন। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (নাজিউর-ফিরোজ) ও ইসলামী ঐক্যজোট এই চারদল জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করে। আওয়ামী লীগ ৩০০ আসেনই প্রার্থী প্রদান করে। এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট নামে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করে।

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী অষ্টম সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়াম লীগ ৪০.১৩% ভোট পায় কিন্তু আসন পায় ৬২টি। অপর পক্ষে বিএনপির ৪০.৯৭% ভোট পেয়ে আসন পায় ১৯৩টি। জামায়াতে ইসলামী ভোট পায় ৪.২৮% আসন পায় ১৭টি। জাতীয় পার্টি (না-ফি) ভোট পায় ১.১২% আসন পায় ৪টি এবং ইসলামী ঐক্যজোট ভোট পায় ০.৬৮% আসন পায় ২টি। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি (না-ফি) ও ইসলামী ঐক্যজোট ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচন করে। তারা মোট ২১৬টি আসন লাভ করে। এরশাদের জোট ৭.২৫% ভোট পেয়ে ১৪টি আসন লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফল অনুসারে বিএনপির চেয়ারপার্সন ও চারদলীয় জোট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ১০ অক্টোবর, ২০০১ সালে ষাট সদস্যের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।

আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে এবং পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি করে। আওয়ামী লীগের দাবি বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব ছিল অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কিন্তু তাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যর্থ হয়েছে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নিয়েছেন এবং সংসদ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেছেন।

৪.৬ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৬ - ২০০৮ঃ

অষ্টম জাতীয় সংসদ পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি ছিল অনেক উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার সময়। ২০০৫ সালের ১৫ জুলাই আওয়ামী লীগ সহ ১৪ দল তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি ও নির্বাচন কমিশন সংস্কারের জন্য ৩১ দফা সংস্কার প্রস্তাব উথাপন করে। সংস্কার প্রস্তাবের মূল দাবিগুলো ছিল-

রাষ্ট্রপতি সকল রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যদের নিয়োগ দান করবেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালীন প্রতিরক্ষা বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যস্ত করণ, নির্বাচন কমিশন সংস্কার, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ও গ্রহণযোগ্য ভোটার তালিকা প্রণয়ন।[২০] সংবিধানের ৫৮গ (৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে.এম হাসান প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের কথা। কিন্তু আওয়ামী লীগসহ ১৪ দল তার বিরুদ্ধে অষ্টম সংসদ চলাকলীন সময় থেকে আপত্তি জানায়। ক্ষমতায় থাকা জোট সরকার সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী দ্বারা বিচারপতিদের অবসরের বয়স বৃদ্ধি করে। ফলে বিচারপতি হাসান হবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। কিন্তু আওয়ামী লীগ সহ ১৪ দল বিচারপতি হাসানের প্রতি আপত্তি জানায়। ২৭ অক্টোবর ২০০৬ অষ্টম জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তিতে বিচারপতি হাসানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর ঠেকাতে ১৪ দল দেশব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সমর্থকদের মধ্যে সংর্ঘষ ছড়িয়ে পড়ে। বিচারপতি হাসানের শপথ গ্রহণের

বিষয়টি ঝুলে থাকে। ২৮ অক্টোবর বিচারপতি কে,এম হাসান আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব গ্রহণে অপারগতা প্রকাশ করেন। রাষ্ট্রপতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বিএনপির মহাসচিবকে সমঝোতায় আসার জন্য বঙ্গভবনে আলোচনার আহ্বান করেন। কিন্তু কোন ঐক্যমতে না আসায় রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৫৮গ(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৯ অক্টোবর রাত ৮টায় নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সহ ১৪ দল সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী অন্য দলের কোন নেতা বা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না।[২১] তখন রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ ৩১ অক্টোবর ১০ জন উপদেষ্টা নিয়োগ ও শপথ পাঠ করান। রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণকে সকল দল থেকে মেনে নেয়া হয়নি। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা অসাংবিধানিক বলে ব্যক্ত করেন। ওয়ার্কাস পার্টির রাশেদ খাঁন মেনন রাষ্ট্রপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণকে "সাংবিধানিক ক্যু" বলে আখ্যায়িত করেন।[২২] রাষ্ট্রপতির প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ ও একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে তিনটি রিট আবেদন করা হয়। অর্থাৎ ইয়াজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়।

বিরোধী দলের প্রথম ও প্রধান দাবি ছিল নির্বাচন কমিশনের সংস্কার। প্রধান নির্বাচন কমিশনের এম.এ আজিজের পদত্যাগের দাবিতে ১৪ দলীয় জোট ১২ নভেম্বর ২০০৬ থেকে লাগাতার চার দিনের অবরোধ পালন করে। লাগাতার আন্দোলনের মুখে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বিচারপতি এম.এ আজিজ শেষ পর্যন্ত ছুটিতে যেতে বাধ্য হলেন।[২৩] নির্বাচন কমিশন দফায় দফায় পরিবর্তন এনে পাঁচবার নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে। সর্বশেষ ২২ জানুয়ারি ২০০৭ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। জোট বদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করণের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ "প্যাকেজ প্রস্তাব" গ্রহণ করে। ৯ ডিসেম্বর, ২০০৭ রাষ্ট্রপতি উপদেষ্টা পরিষদের সাথে কোন আলোচনা ছাড়াই আকস্মিক ভাবে সারাদেশে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করেন।

প্যাকেজ প্রস্তাব বাস্তবায়ন ও সেনা মোতায়েন নিয়ে বিরোধের কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ৪ জন উপদেষ্টা ১১ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন।[২৪] হরতাল, অবরোধ ও ঘেরাও কর্মসূচির কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, ঘটতে থাকে প্রাণহানি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিন দিন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জনগণও আর এ অবস্থাকে মেন নিতে পারছিল না। দরিদ্র দেশের অর্থনীতি অচল হয়ে পড়ে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করে এবং নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। মহাজোট ৭ জানুয়ারি থেকে ২৭ ঘন্টার দেশব্যাপী টানা অবরোধ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারি থেকে লাগাতার বঙ্গভবন ঘেরাও ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি সারাদেশে অবরোধ, ২১ ও ২২ জানুয়ারি হরতাল, নির্বাচন হলে ২৩ জানুয়ারি থেকে লাগাতার হরতাল কর্মসূচী ঘোষণা করে।[২৫]

মহাজোট নির্বাচন বর্জন এবং লাগাতার হরতাল অবরোধ কর্মসূচী, বিদেশী পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণ মিশন তুলে নেয়া, উপদেষ্টাদের পদত্যাগ সারা দেশে সহিংসতা ইত্যাদি বিষয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা ও কার্যক্রমকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। এরূপ এক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ ১১ জানুয়ারি ২০০৭ সন্ধ্যায় ঢাকাসহ সারাদেশে কারফিউ জারি করেন এবং প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দেন।[২৬] ১২ জানুয়ারি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গর্ভনর ড. ফখরুদ্দীন আহমদ। পরবর্তীতে তিন পর্যায়ে পুনর্গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ১০ উপদেষ্টা নিয়োগ লাভ করেন এবং শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মহাজোট নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করলেও চারদলীয় জোট নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেননি। পূর্বতন সকল নির্বাচন কমিশনার পদত্যাগ করেন এবং ড.এ.টি.এম শামসুল হুদার নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হয়। ভোটার তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে ছবিযুক্ত ভোটার ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। হাইকোর্ট ২৭ মার্চ ২০০৭ তারিখে ২২ জানুয়ারি নির্বাচনের জন্য তৈরি ভোটার তালিকা বাতিল ঘোষণা করে এবং একই সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে

নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ আলাদা করার সুপারিশ করে। সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাজনৈতিক দলগুলোকে অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক সংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন করে। সরকার ঘোষণা করে বিধিবদ্ধ ও রেজিস্ট্রেশন ব্যতীত কোন রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। রেজিস্ট্রেশনের জন্য দলগুলোকে তৃণমূল পর্যায় থেকে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা আর্থিক আয়-ব্যায়ের স্বচ্ছতা এবং অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক সংস্কারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক উদ্যোগগুলো, বিশেষ করে দ্রুত বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), সরকারি কর্মকমিশন পুণর্গঠন দুর্নীতি বিরোধী অভিযানসহ বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কর্মসূচীতে মানুষ উৎসাহী হয়। কিন্তু জমি উদ্ধারের নামে সারা দেশে হাট-বাজার ভাঙ্গা, হকার ও বস্তি উচ্ছেদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। খাদ্য ও পণ্যের দাম আগের যেকোন সময়ের তুলনায় অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় ড. ফখরুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কিছূ রাজনৈতিক সংস্কারের চিন্তা ও পদক্ষেপে রাজনৈতিক ও সচেতন মহলে নানামুখী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে দুই নেত্রীকে দেশের বাইরে পাঠানো ও তাঁদের রাজনীতি থেকে বিরত রাখার চেষ্টা, বড় দলগুলোর ভেতরে সংস্কারের নামে বিভেদ সৃষ্টি, নতুন দলগঠন প্রভৃতি বিষয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বড় দুই শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মামলা ও তাঁদের বিচারের সম্মুখীন করার উদ্যোগ সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সমালোচনার ক্ষেত্র তৈরি করে। এক পর্যায়ে ২০০৮ সালের মে মাসের শেখ হাসিনা নির্বাহী আদেশে ও আগস্ট মাসে বেগম জিয়া আইনী প্রক্রিয়ায় মুক্তিপান। দুর্নীতির অভিযোগে যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন তারা জামিন পান। এটা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, ওপর থেকে চাপিয়ে দেয়া কোন পরিবর্তন ও সংস্কার সফল হয়না। সরকার ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন তারিখ ঠিক করে। সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সরকার যতদূর সম্ভব নমনীয়ও হয়।

৪.৭ ২০০৮ সালের নির্বাচন ঃ

অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩৮ টি রাজনৈতিক দল নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে ১৫৬৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন । এ নির্বাচনে ৮৭.১৩ শতাংশ ভোটার তাদের ভোট প্রদান করেন। প্রায় ১৫৯১১৩ জন দেশী এবং ৫৯৩ জন বিদেশি পর্যবেক্ষক এ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বে মহাজোট নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে, মন্ত্রিসভা গঠন করে।[২৭]

সারণি: ৪.১

২০০৮ সালের নির্বাচনের ফলাফলঃ

জোট	দল	ভোট	%	আসন
মহাজোট	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৩৮৮৭৪৫১	৪৯.০%	২৩০
	জাতীয় পার্টি	৪৮৬৭৩৭৭	৭.০%	২৭
	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৪২৯৭৭৩	০.৬%	৩
	ওয়ার্কাস পার্টি	২১৪৪৪০	০.৩%	২
	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১৬১৩৭২	০.২%	১
চারদলীয় জোট	বি এন পি	২২৯৬৩৮৩৬	৩৩.২%	৩০
	জামাত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ	৩১৮৬৩৮৪	৪.৬%	২
	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	৯৫১৫৮	০.১%	১
	ইসলামী ঐক্যজোট	-	-	-
স্বতন্ত্র		৩৩৬৬৮৫৮	৪.৯%	৪
মোট		৬৯১৭২৬৪৯	৯৯.৯৯%	৩০০

উৎসঃ নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ (পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। https://www.ecs.gov.bd/files/14jieif2OAZDbJifbCrdFE2yZ6Ed0XLXfSMe1HCJ.pdf)

৪.৮ ২০১৪ সালের নির্বাচন ঃ

২০১১ সালের ৩০ জুন আওয়ামী লীগ সরকার সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করে। এর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায় এবং সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ বহাল রেখে দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করা হয়। তখন থেকেই নির্বাচন নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ও তার শরিক জোটগুলো নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারব্যবস্থা পুনরায় চালু করার জন্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তৎকালীন সরকারি দল আওয়ামী লীগ ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারের অধীনেই নির্বাচনের ঘোষণা দেন এবং তখনই বিরোধী দলীয় প্রধান খালেদা জিয়া সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না বলে ঘোষণা দেন।

নির্বাচন কমিশন ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। প্রধান বিরোধী দল বিএনপিসহ বেশির ভাগ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। বিএনপির পক্ষ থেকে টানা অবরোধের মাধ্যমে নির্বাচন প্রতিরোধের কর্মসূচি দেয়া হয়। মহাজোটের অংশীদার জাতীয় পার্টি প্রথমে নির্বাচনে না যাওয়ার কথা জানালেও নানামুখী চাপে দলটি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। অন্যতম বৃহৎ দল বিএনপির বর্জন সত্ত্বেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 'একতরফা' এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও এর জোটভুক্ত দলগুলোসহ মাত্র ১২টি দল অংশ নেয়। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন জোট ও তাদের শরিক দলের প্রার্থীরা ভোটের আগেই ৩০০ আসনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি অর্থাৎ ১৫৩ আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হন। ফলে ১৪৭ আসনে নির্বাচন আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। ১৪৭ টি নির্বাচনি এলাকায় গড়ে ৪০.০৪ শতাংশ ভোটার ভোট প্রদান করেন।[২৮] এ নির্বাচনের সহিংসতা অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়। ভোটের দিন সহিংসতায় ২১

জন নিহত হন। নির্বাচনসামগ্রীতে অগ্নিসংযোগ, ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের মারধর, পাঁচ শতাধিক কেন্দ্রভিত্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসহ ভোট গ্রহণে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় তিনশ জন হতাহত হন।[২৯]

সারণি: ৪.২

২০১৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলঃ [৩০]

দলের নাম	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত শতকরা ভোটের হার
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩৪	৭২.১৪
জাতীয় পার্টি	৩৪	৭.০০
ওয়ার্কার্স পার্টি	৬	২.১০
জাসদ (ইনু)	৫	১.১৯
তরীকত ফেডারেশন	২	১.০৪
জাতীয় পার্টি (জেপি)	২	০.৭৩

উৎসঃ আমিন, নেসার. (সম্পাদিত). *বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও ফলাফল*

নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তৃতীয় দফা সরকার গঠিত হয়। এরশাদের নেতৃত্বে জাতীয় পর্টি হয় বিরোধী দল, পাশাপাশি দলটি থেকে মন্ত্রীও করা হয় এবং এরশাদকে বানানো হয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত। প্রশ্ন উঠে জতীয় পার্টি বিরোধী দল না সরকারের অংশ। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় তা কখনই শোভন নয়। বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রবর্তন এক গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা। ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ ব্যবস্থা জনমনে অনেক আশার সঞ্চার করে। কিন্তু ২০০৭ সালে তা পথ হারিয়ে ফেলে। ২০০৮ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারও বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকতে পারেনি। পরবর্তীতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও

নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশার প্রদীপ নিভে যায়। যার প্রমাণ ২০১৪ সালের নির্বাচনে ১৫৩টি আসনে বিনা ভোটে প্রার্থী নির্বাচিত হয়। অর্থাৎ নির্বাচন ছাড়াই দল ক্ষমতায়। ফলে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সমাজের সকল স্তর হতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার এর দাবি উত্থাপিত হয়। নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন পদ্ধতি, রাজনৈতিক দলের সংস্কার সর্বত্র আলোচনায় আসে। মূল লক্ষ্য হলো নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য করা। নির্বাচন যাতে প্রশ্নবিদ্ধ না হয়। নির্বাচন কমিশন যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, নির্বাচনকালীন সময়ে যাতে নিরপেক্ষ সরকার থাকে। এমনকি ফাষ্ট পাষ্ট দা পোষ্ট কিংবা পিআর কোনটি জনমতের প্রতিফলনে বেশি কার্যকর তাও সংস্কার আলোচনায় আসবে। কঠোর নির্বাচনী আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কালো টাকা ও পেশি শক্তিকে দমন করে সৎ, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান রাজনীতিকদের দেশ পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তবেই আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজিক সাম্য, জনগণের স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়। পরবর্তিতে আপিল বিভাগ ২০ নভেম্বর, ২০২৫খ্রি. নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তির রায় অসাংবিধানিক ও বাতিল ঘোষণা করে। একই সঙ্গে ত্রয়োদশ সংশোধনী বৈধ ঘোষণা করে সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল ও পুনরুজ্জীবিত করেছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। তবে তা কার্যকর হবে চতুর্দশ সংসদ নির্বাচন থেকে।[৩১]

বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি কার্যকর অন্তবর্তী সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হয়। আমাদের দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন বাস্তবায়নে দলীয় সরকারের চেয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনেক কার্যকর। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার’ ব্যবস্থা প্রবর্তন অনেক গুরুত্ব বহন করে।

৪.৯ তথ্যপুঞ্জী ঃ

১. অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিসি. আলম. মুহাম্মদ জহিরুল.(২০১১). *বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা*. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়. পৃ.৩৭)

২. মজুমদার, বদিউল. আলম. (৩ অক্টোবর, ২০০৭). নব্বইয়ের অঙ্গীকার বরখেলাপের পরিণাম. *প্রথম আলো*.

৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৯০

৪. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ঢাকা ১৬ মার্চ ১৯৯১

৫. *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

৬. *ইনকিলাব*, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১

৭. আখতার, মুহাম্মদ. ইয়াহ্ইয়া. (১৯৯১). *দুর্নীতির স্বরূপ অন্বেষণ ঃ বাংলাদেশ*. নিবেদন প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন, পৃ.১৪৬

৮. প্রাগুক্ত, আখতার, মুহাম্মদ. ইয়াহ্ইয়া.পৃ.১৪৭

৯. প্রাগুক্ত, মজুমদার, বদিউল. আলম. প্রথম আলো, ৩ অক্টোবর, ২০০৭

১০. *দৈনিক যায়যায় দিন*, নভেম্বর ৬, ২০০৬

১১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩

১২. (অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিসি. আলম. মুহাম্মদ জহিরুল.(২০১১). *বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা*. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়. পৃ.৪১

১৩. *দৈনিক যায়যায় দিন*, ৬ নভেম্বর ২০০৬

১৪. *দৈনিক যায়যায় দিন*, ৬ নভেম্বর ২০০৬

১৫. অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিসি. আলম. মুহাম্মদ জহিরুল.(২০১১). *বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা*. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়. পৃ.৪৬)

১৬. The CCHRB Election Observation report: The Eight Parliamentary Election 2001. P16-17

১৭. Akther, Yeahia, Mohammad, Election Correption in Bangladesh, Ashate, 200, P-150

১৮. Ibid, P-30

১৯. Ibid, P-17

২০. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ১৬ জুলাই, ২০০৫

২১. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা-৩০ অক্টোবর, ২০০৬

২২. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ৩০ অক্টোবর, ২০০৬

২৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, ঢাকা, ২৩ নভেম্বর ২০০৬

২৪. আকবর আলী খান, লে.জে. অবঃ হাসান মশহুদ চৌধূরী, সি.এম. শফি সামি ও সুলতানা কামাল পদত্যাগ করেন।

২৫. *যুগান্তর*, ঢাকা, ১১ জানুয়ারি ২০০৭

২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ১২ জানুয়ারি ২০০৭

২৭. পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। https://www.ecs.gov.bd/files/14jieif2OAZDbJifbCrdFE2yZ6Ed0XLXfSMe1HCJ.pdf

২৮. পরিসংখ্যান প্রতিবেদন ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। https://www.ecs.gov.bd/files/PjkqznV62UnbChDNA47y6iZovaHngtTnP6doAfwz.pdf

২৯. *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ https://www.bd-pratidin.com/last-page/2014/09/12/29866

৩০. আমিন, নেসার. (সম্পাদিত). *বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও ফলাফল*

৩১. *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, ২১ নভেম্বর ২০২৫

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সমস্যাবলী

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সমস্যাবলী

নির্বাচন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অংশ। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"[১] অর্থাৎ গণতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশর রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সাংবিধানিক পালনীয়গুলোর মিল অনেক সময়ই থাকে না। সংবিধানে আছে গণতন্ত্র হবে দেশটির রাজনৈতিক ব্যবস্থা। কিন্তু দীর্ঘ দিন এ দেশে চলেছে সামরিক শাসন, স্বৈরশাসন। বাংলাদেশের মানুষ সর্বদা সত্যিকার ভাবে সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সহিংসতামুক্ত নির্বাচন চেয়েছে। কিন্তু সকল নির্বাচন এ মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

নির্বাচন নিয়ে সর্বদাই একটি সংকট তৈরি হয়। প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন সকলেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এর পেছনে সত্যতাও থাকে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি, ভোটার তালিকা, লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে সাংবাদিকগণ প্রশ্ন তোলেন। অনেক সময় তৈরি হয় রাষ্ট্রীয় সংকট। যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বাঁধার সৃষ্টি করে।

নির্বাচন এ দেশে নতুন নয়। তার ইতিহাস নানা আকারে প্রায় শত বছরের পুরোনো। ব্রিটিশ শাসন আমলেও এখানে কয়েক বার নির্বাচন হয়েছে, অবশ্য স্বার্বজনীন ভোটের

ভিত্তিতে তা হয়নি। পাকিস্তানি শাসন আমলে জনগণের পূর্ণ ভোটাধিকার প্রয়োগের ভিত্তিতে দুটি নির্বাচন হয়েছে। একটি **১৯৫৪** সালে মুসলিম লীগ সরকারের আমলে আর দ্বিতীয়টি **১৯৭০** সালে জেনারেল ইয়াহিয়ার সামরিক আমলে। কিন্তু ভোট কারচুপির অভিযোগ ব্যাপকভাবে উঠতে লাগলো স্বাধীন বাংলাদেশে।[২] ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজেদের স্বার্থে সরকারের প্রতিটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণের প্রবণতাও একই সঙ্গে শুরু হয়। সময়ের সাথে সাথে এ প্রবণতা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন কি কোন রকম রাখঢাক না করে "আমদের লোক আর তাদের লোক" বলে ভাগ করা শুরু হয়। এ হিসেবে কারো নিরপেক্ষ নির্দলীয় থাকার পথও থাকে না। অনাকাংখিতভাবে সর্বক্ষেত্রে দলীয়করণ শুরু হয়। যা এক সময় বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে নির্বাচনকে কলুষিত করে। শুরু হয় নির্বাচনী দুর্নীতি।

৫.১ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুর্নীতির স্বরূপ (২০১৪ পর্যন্ত)ঃ

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দুর্নীতির স্বরূপ তুলে ধরলে বোঝা যাবে যে, আমাদের নির্বাচনী দুর্নীতি কিভাবে বাড়ছে এবং তা বর্তমানে কোন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। তবে মনে রাখা দরকার যে, ১৯৭৩ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও নানা রকম দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছিল। তৎকালীন বিরোধী দল, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলনেতা আ,স,ম আব্দুর রব এ নির্বাচনে অনেক জাসদ প্রার্থীকে মনোনয়ন পত্র পেশ করতে দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন। তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তাঁর পদত্যাগ দাবি করেন।[৩] **১৯৭৯** সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাল ভোট দেবার ঘটনা প্রমাণ করে যে, নির্বাচনী দুর্নীতি ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে। তারপরও তা সর্বক্ষেত্রে '৮০র দশকের কেন্দ্র দখলের পর্যায়ে পৌঁছেছিল না। সন্ত্রাসের চর্চা হলেও ভোট কেন্দ্রে কমবেশী লোক সমাগম হয়েছিল এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় জনগণ কমবেশী ভোট দিয়েছিলেন। অবশ্য বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য নেতারা সরকারি দলের ব্যাপক কারচুপি, সন্ত্রাস ও বিরোধী দলীয় এজেন্টদেরকে ভোট কেন্দ্র থেকে বের

করে দেয়ার অভিযোগ করেছিলেন।[৪] সামরিক সরকার লালিত মাস্তান বাহিনী যে সরকারি উদ্যোগে সৃষ্ট নতুন রাজনৈতিক দলের স্বপক্ষে সন্ত্রাস করবে সেটাই স্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য। তৎকালীন নির্বাচনে জনগণ তা প্রত্যক্ষ করেছে।

১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুর্নীতি, নির্বাচনী সন্ত্রাস আরো একধাপ এগিয়ে যায়।[৫] নির্বাচনী সন্ত্রাসে শুধুমাত্র নির্বাচনের দিনই (৭ মে) ১৫ জন নিহত এবং ৭৫০জন আহত হন।[৬] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেসনোট অনুযায়ী ২৮৪টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখতে হয়।[৭] নির্বাচন কমিশন জানায় যে, ৩৬টি নির্বাচনী এলাকায় কিছু সংখ্যক ভোট কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ভোট গ্রহণ স্থগিত ঘোষণা করা হয়।[৮]

আওয়ামী লীগের আমন্ত্রণে 'অবাধ নির্বাচন গণকমিশন' নামে একটা পর্যবেক্ষক সংগঠনের আমন্ত্রণে তিনজন ব্রিটিশ নাগরিক।[৯] এ নির্বাচনে পর্যবেক্ষণে আসেন। তারা এ নির্বাচনকে গণতন্ত্রের ট্রাজেডী হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, গণতন্ত্রে উত্তোরনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের মতে সংসদ নির্বাচন কোনভাবেই অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়নি। জোর জবরদস্তি ভোট কেন্দ্র দখল ও ব্যাপক কারচুপি ছিল বেলা এগারোটার পর ভোট কেন্দ্রগুলোতে স্বাভাবিক ব্যাপার। নির্বাচন কমিশন অবশ্য এক প্রেসনোটে গণ কমিশনের এ দায়িত্ব পালনকে একটি সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সামিল বলে উল্লেখ করেন এবং বিষয়টিকে বেআইনি এবং নির্বাচন কমিশনের এখতিয়ারের উপর হস্তক্ষেপের সামিল বলে উল্লেখ করেন।[১০]

বিদেশী সাংবাদিকদের চোখে এ নির্বাচন ছিল প্রহসনমূলক, কারচুপি জড়িত এবং ভোট ডাকাতির বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এদের অনেকেই এ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য নিজ নিজ পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন।[১১] অনেক বিদেশী পর্যবেক্ষক এ নিয়েও

মন্তব্য করেন। এ নির্বাচন উপলক্ষে ঢাকায় অবস্থানরত বিবিসি সংবাদদাতা মার্ক টালীর মন্তব্যে তা উঠে আসে। তাঁর ভাষায়, যেসব ভোট কেন্দ্রগুলোতে আমি গিয়েছি সেগুলোর সবকটিতে ভোটদাতাদের সংখ্যা ছিল কম। রিটার্নিং অফিসারেরা স্বীকার করেন যে, ভোটাররা কম হারে ভোট দিতে এসেছেন।[১২] অধিকাংশ সাংবাদিকদের মতে এ নির্বাচনে ভোটাররা শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ হারে ভোট দিয়েছেন।[১৩] অতএব এ নির্বাচন কতটা অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছিল এবং এতে গণ রায়ের কেমন প্রতিফলন ঘটেছিল তা সহজেই ধারণা করা যায়।

আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে পাই, নির্বাচনী দুর্নীতি চূড়ান্ত প্রহসন ও বুথ দখলের খেলায় পরিণত হয় ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।[১৪] এ নির্বাচনে দেশের অধিকাংশ নির্বাচন কেন্দ্রে ভোটাররা ভোট দিতে আসেন নি। রাজপথ ছিল জনশূন্য। ভোট কেন্দ্রে প্রার্থীদের নির্বাচনী ক্যাম্প ছিল না, ছিল না ভোটারদের আনা নেওয়ার জন্য যানবাহনের ভিড়। এক কথায় এ নির্বাচন ছিল অতীতের নির্বাচনী ট্রাডিশন বহির্ভূত এবং নির্বাচনী উত্তাপ বিবর্জিত। প্রধান দুটি বিরোধী রাজনৈতিক জোট এ নির্বাচন বর্জন করায় নির্বাচনী সন্ত্রাসে সরকারি দলের (জাতীয় পার্টি) আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বেগ পেতে হয়নি। তারপরও ব্যাপক নির্বাচনী সন্ত্রাস হয়েছে এবং শুধুমাত্র ঢাকায় ৭২টি ভোট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত হয়ে যায়। নির্বাচনী গোলযোগে শুধু ঢাকাতেই সাতজন নিহত এবং তিন শতাধিক আহত হন, যার মধ্যে ৬৭ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[১৫]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে দুর্নীতির স্বরূপ আমরা পেলাম তা থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে নির্বাচন দুর্নীতি, কারচুপি ও সন্ত্রাস এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে, পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার বর্জিত অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান কল্পনায় পরিণত হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনেই পেশিশক্তি ও অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারের চর্চা হচ্ছে এবং তার প্রতিফলন প্রাক নির্বাচনী, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচনোত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্ম

তৎপরতায় নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে উপাদান যোগাচ্ছে। সমাজ কাঠামোতেও তা প্রভাব ফেলছে।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচন প্রথমবারের মত একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ, অস্থায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রবল গণআন্দোলনের চাপে ১৯৯০ এর ডিসেম্বরে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করেন। তার কাছ থেকে ক্ষমতা গ্রহণকারী বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের অস্থায়ী সরকারকে সকল রাজনৈতিক দল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়। এ নির্বাচন দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং নির্বাচন কমিশন নজিরবিহীন সতর্কতা ও নতুন নতুন উপায় অবলম্বন করেন। যা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের উত্তরণের আশার সঞ্চার করে। কিন্তু পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে পরাজিত পক্ষ নির্বাচনকে মেনে নেয়নি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আট দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বে সাত দলীয় জোট এবং বামপন্থী পাঁচ দলীয় জোট অংশগ্রহণ করে। জোটগুলো এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনের আগের দিন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ রেডিও-টিভিতে জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক ভাষণে নিরপেক্ষ নির্বাচনের অঙ্গীকার করেন। ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়। ১৯৯১ সালের এ নির্বাচনে ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ২১ লাখ ৮১ হাজার ৭৪৩ জন। ভোট পড়ে ৩ কোটি ৪৪ লাখ ৭৭ হাজার ৮০৩ টি। ভোটারের হার ছিল ৫৫.৪৫ শতাংশ।[১৬] নির্বাচনে কোথাও বড় ধরণের কোন সহিংসতা দেখা যায়নি। এ নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি আসনে জয়লাভ করে, আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে ৮৪টি আসনে, জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসনে এবং জামায়াতে ইসলামী ১৮টি আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরপরই আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, অগণতান্ত্রিক শক্তি সূক্ষ্ম কারচুপি করেছে।[১৭]

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ এর বিতর্কিত নির্বাচন পুনরায় নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিএনপি সরকার এ নির্বাচন আয়োজন করে। বড় সবকটি রাজনৈতিক দল সে নির্বাচন বয়কট করে। ১৯৯৪ সালে মাগুরা জেলার একটি উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রথমে এ সংকট শুরু হয়। আওয়ামী লীগ সে উপ-নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ আনে এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন দাবি উপস্থাপন করে। বিএনপি শুরু থেকেই সে দাবির বিরোধিতা করে। জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী এই দাবিকে সমর্থন করে। এক পর্যায়ে দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন জোরদার হয়।

এ দাবিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ ১৯৯৫ সালে বছর-জুড়ে বিভিন্ন সময় হরতাল এবং অবরোধসহ নানা রাজনৈতিক কর্মসূচী দেয়। বিএনপি সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে বলে যুক্তি দেয়। নির্বাচনের দিন বিভিন্ন জায়গায় সহিংসতায় অন্তত ১০ জন নিহত হবার সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সে নির্বাচন ছিল একতরফা এবং ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই কম। প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতার সকল চেষ্টা বিফলে যায়। বিরোধী দলগুলোর তীব্র আন্দোলন, বিরোধিতা ও বয়কটের মুখে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এ কে এম সাদেক সাংবাদিকদের বলেন, কত শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে সেটি বড় কথা নয়। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেটাই আসল কথা। ৩০০ আসনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৫০টি আসনে। ৪৬টি আসনে একাধিক প্রার্থী না থাকায় বিএনপির প্রার্থীরা ভোটের আগেই নির্বাচিত হন।[১৮]

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর বিরোধী দলগুলোর জোরালো আন্দোলনের ফলে ধারণা করা যাচ্ছিল যে শীঘ্রই আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। কূটনীতিকদের সমঝোতা চেষ্টা এবং তীব্র চাপের প্রেক্ষাপটে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ

হাসিনাকে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। ১৯৯৬ সালের ২৬ মার্চ ভোররাতে বহুল আলোচিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল সংসদে পাশ হয়। ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন এবং ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হন বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৪৬ টি আসন এবং বিএনপি পেয়েছিল ১১৬টি আসন। এছাড়া জাতীয় পার্টি ৩২টি এবং জামায়াতে ইসলামী ৩টি আসনে জয়লাভ করেছিল। সরকার গঠন করার জন্য কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। এর মাধ্যমে ২১ বছর পরে ক্ষমতার মঞ্চে ফিরে আসে দলটি।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পর বিএনপির তরফ থেকে ফলাফল মেনে নেয়া হয়নি। দলটির তৎকালীন মহাসচিব আবদুস সালাম তালুকদার এক সংবাদ সম্মেলনে ১১১টি আসনে পুনরায় নির্বাচন দাবি করেন। বিএনপির স্থায়ী কমিটির তৎকালীন সদস্য একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, ইতিহাসের নজিরবিহীন কারচুপি করা হয়েছে। এ কারচুপি পূর্বপরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলক। এর একদিন পরেই বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, বিএনপি নির্বাচনের ফল গ্রহণ কিংবা বর্জন কোনটাই করেনি।[১৯]

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনাবহুল অধ্যায়। ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ করে সংবিধান অনুসারে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আওয়ামী লীগ সরকার। তখন প্রধান উপদেষ্টা পদে আসীন হন তৎকালীন সদ্য সাবেক প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ গ্রহণের কয়েক-ঘণ্টার মধ্যে প্রশাসনে বড় ধরণের রদবদল করেন। প্রধান উপদেষ্টার আদেশে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিসহ ১৩জন সচিবকে

একসাথে সরিয়ে দেয়া হয়। সে সময় বিষয়টি বিএনপি ইতিবাচকভাবে দেখলেও আওয়ামী লীগ বিষয়টিকে ভালোভাবে নেয়নি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুলিশের মাধ্যমে বিশেষ অভিযান শুরু করে। সারা দেশকে ৬৮টি সেক্টরকে ভাগ করে এ অভিযান শুরু করা হয়েছিল। নির্বাচনের প্রচার চালানোর সময় শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি অভিযোগ করেন, বিএনপি যা বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তাই করে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বিএনপি জয় লাভ করে।

নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে শেখ হাসিনা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, স্থূল কারচুপি করে জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। জনগণ নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেছে, আমার মেনে নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। নির্বাচনের পরে নতুন আরেক পরিস্থিতির তৈরি হয়। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে হিন্দুদের উপর হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ এবং লুটপাটের অভিযোগ আসতে থাকে। সংসদের যোগ না দেবার ব্যাপারে বেশ অনড় ছিলেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনা বলেন, কারচুপির নির্বাচন বাতিল এবং জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম চলবে। নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী লীগ সারাদেশে আধাবেলা অবরোধ কর্মসূচির ডাক দেয়। এছাড়াও তারা আরো কিছু কর্মসূচী ঘোষণা করে এবং অভিযোগ করেন, ক্ষমতাসীন দলের 'সন্ত্রাসীরা' সারাদেশে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সংখ্যালঘুদের হত্যা করছে। অত্যাচার, নির্যাতন, বাড়িঘর লুটপাটের অভিযোগও তোলেন তিনি।[২০]

বিশ্লেষকগণ মনে করেন ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ছিল বাংলাদেশে সর্বশেষ সুষ্ঠু নির্বাচন। ২০০১ সালে নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিএনপি সরকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা বাড়িয়ে সংবিধানে একটি সংশোধনী আনে। অভিযোগ উঠে নিজেদের পছন্দের প্রধান

বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে রেখে নির্বাচনে অংশ নিতে চেয়েছে বিএনপি সরকার।

বিষয়টি নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে তখনকার বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। বিশৃঙ্খল ও সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ২০০৭ সালের ১১ জানয়ারি সেনাবাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে। জারি করা হয় জরুরী অবস্থা। ড. ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে একটি নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এটি কার্যত পরিচালনা করেছে সেনাবাহিনী। সরকার নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন এবং ছবি সহ ভোটার তালিকা তৈরি করে। সরকার সবদলের অংশগ্রহণে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নানা সমঝোতার চেষ্টা চালিয়ে যায়। পর্দার সামনে এবং আড়ালে বিএনপি-আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টারা এবং সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে কিনা সেটি নিয়ে ২০০৮ সালের গোড়া থেকেই সন্দেহ শুরু হয়। নির্বাচনে অংশ নেবার বিষয়ে খালেদা জিয়ার কিছু আপত্তি ছিল।

নির্বাচনের জন্য আওয়ামী লীগের প্রস্তুতি আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনের হিসেব অনুযায়ী ২০০৮ সালের সাধারন নির্বাচনে ৮৬.২৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ২৩০টি আসন। বিএনপি পেয়েছিল ৩০টি আসন। সে নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী দুটি আসনে জয়লাভ করেছিল। নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে পারেনি বিএনপি। দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ তোলা হয়।[২১]

২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসের একতরফা নির্বাচনের যেসব নজির রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধান থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি বাতিল করা হয়। আদালতের রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক হিসেবে বর্ণনা করে হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের অধীনে অনুষ্ঠিত

একতরফা সে নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা দেশে-বিদেশে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। বিএনপি এবং তাদের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের জন্য ২০১২ সাল থেকে আন্দোলন করছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ তাদের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিল। বিরোধীদের দাবি উপেক্ষা করেই নির্বাচনের দিকে এগুতে থাকে ক্ষমতাসীনরা। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার যখন নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন দেশের পরিস্থিতি বেশ উত্তপ্ত। এর মধ্যেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল ৩রা ডিসেম্বর। ৩০০টি আসনে মনোনয়নপত্র জমা পড়েছিল ১১শ'র মতো। নির্বাচনের ১০দিন আগে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল ১৫দিনের জন্য সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়। সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনের উদ্দেশ্য ছিল ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেন। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছিল, ততই সহিংসতাও বাড়তে থাকে। নির্বাচনের আগে ৩৮টি জেলায় প্রায় দেড়শ'র মতো কেন্দ্রে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় ব্যালট পেপার ও নির্বাচন সরঞ্জাম পুড়িয়ে দেয়ার ঘটনা ঘটে। অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং তাদের রাজনৈতিক মিত্র জামায়াতে ইসলামী সে নির্বাচন বয়কটের প্রেক্ষাপটে অর্ধেকের বেশি আসনে ভোট গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৫৪ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিল। নির্বাচনের দিন ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৪৬টি আসনে।

চিত্রঃ নির্বাচনী সহিংসতা

উৎসঃ https://www.bbc.com/bengali/articles/c973ldzq4gdo

চিত্রঃ ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনে ভোট দিতে যাবার সময় নির্বাচনী সহিংসতা। ছবিটি রাজশাহী এলাকা থেকে তোলা হয়েছিল।[২২]

৫.২ নির্বাচন মানেই টাকার ছড়াছড়ি ঃ

নির্বাচন মানেই টাকার ছড়াছড়ি । বিগত জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবাই লক্ষ্য করেছে। সঠিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এ অনাকাঙ্খিত ঘটনাগুলো ঘটে চলছে। এ কারণেই নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদদের টাকার জোরে হটিয়ে দিয়ে নগ্নভাবে সংসদে জনগনের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে কালো টাকার মালিকেরা। পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারা যায় কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে মনোনয়ন বিক্রি হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, পঞ্চম জাতীয় সংসদে সরাসরি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত সাংসদের সংখ্যা ছিল ৬৮ শতাংশ, সপ্তম সংসদেই তা বেড়ে দাড়িঁয়েছে ৭২ শতাংশে আর অষ্টম সংসদে তা বেড়ে হয়েছে ৮৮ শতাংশ।[২৩] নির্বাচন ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে ত্যাগী রাজনীতিবিদেরা ধীরে ধীরে জাতীয় রাজনীতিতে অপাংতেয় হয়ে যাচ্ছেন এবং টাকার জোরে তাঁদের স্থান পূরণ করেছেন ব্যবসায়ীরা। এর ফলশ্রুতিতে আমরা লক্ষ্য করি নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে যারা অর্থ ব্যয় করে তারা নির্বাচিত হন, তাঁরা পরবর্তীতে সে অর্থ সুদে আসলে ফিরে পেতে চেষ্টা করেন। ফলে জনগণের সেবার অঙ্গীকার পরিবর্তিত হয়ে ব্যক্তি ও দল সেবায় পরিণত হয়। সৃষ্টি হয় দল দাসের সংস্কৃতি। আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা দেশ ও জাতির জন্য দুর্ভাগ্যজনক ও ক্ষতিকর। নির্বাচন ব্যবস্থা কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য। জাতীয় নির্বাচনে বেশির ভাগ প্রার্থী নির্বাচনী ব্যয়ের সীমারেখা অতিক্রম করেন, ফলাফল ঘোষণার ১৫ দিনের মধ্যেই নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব দেওয়ার বিধান থাকলেও তা মানা হয় না। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলো নির্বাচন (বিশেষ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে) প্রচুর টাকা খরচ করা হয়। যার অধিকাংশই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সংগৃহীত কালো টাকা।[২৪] বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমরা একই বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই।

৫.৩ সামরিক -বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য ঃ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে গোড়া থেকে বেসামরিক আমলাদের আধিপত্য লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের প্রথম থেকে যদিও শেখ মুজিবুর রহমান আমলাদের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রশাসনে নিজ দলের প্রাধান্য এবং হস্তক্ষেপের জন্য তিনি আমলাদের বিরাগভাজন হন এবং তাদের আশানুরূপ সহযোগিতার লাভে ব্যার্থ হন। পরবর্তী সময়ে জেনারেল জিয়ার আমলেও সামরিক বেসামরিক এলিটদের আধিপত্য উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্যণীয়। ১৯৮১ সালের ২৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভার এক চতুর্থাংশ ছিলেন সামরিক আমলা এবং প্রায় অর্ধেক ছিলেন বেসামরিক আমলা ও টেকনোক্যাট। জেনারেল এরশাদের শাসন আমলেও বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য অব্যাহত থাকে। ১৯৮৮ সালের মে মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এরশাদের মন্ত্রিসভায় সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের অবস্থান।

সামরিক আমলা	১৩ জন
বেসামরিক আমলা	৯ জন
বুদ্ধিজীবী আমলা	৭ জন
ব্যবসায়ী	৬ জন
মোট	৩৫ জন

এরশাদের পতনের পর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভায়ও কতিপয় সামরিক ও বেসামরিক আমলার অনুপ্রবেশ ঘটে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক নেতৃত্বে এই ধারাবাহিকতা লক্ষ্যণীয় হয়।

বিগত সকল অন্তবর্তী সরকারে আমরা সামরিক -বেসামরিক আমলাদের দাপুটে উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। একইভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সামরিক-বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য প্রকাশ পায়।

৫.৪ দলছুট প্রবণতা ও ডিগবাজি নেতৃত্ব ঃ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সর্বদা বিভিন্ন দল ভাঙ্গার ও নতুন দল গড়ার হিড়িক দেখা যায়। সর্বদাই চোখে পড়ে রাজনৈতিক নেতাদের দলছুট এবং ডিগবাজি। বার বার সরকার পরিবর্তন হয় কিন্তু একই মুখ এবং একই নেতাই ঘুরে ফিরে আসে। ক্ষমতার মোহে জোট বদ্ধতা খুব সাধারণ ব্যাপার।

৫.৫ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নেতৃত্ব ঃ

বাংলাদেশের নেতৃত্ব অনেকটা পরিবারতান্ত্রিক, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যারিশমা ও ধারাবাহিকতার ভিত্তিতেই শেখ হাসিনা দলের নেতৃত্ব দান করছেন। অপরদিকে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াও শহিদ রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতায় এসেছেন। এভাবে বাংলাদেশের বড় বড় দুটো রাজনৈতিক দল পুরোপুরি পরিবারতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে, যা আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক চর্চাকে ব্যাহত করছে। কেননা, আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশ ও দলের স্বার্থের থেকে নিজের স্বার্থের প্রতি অতি আগ্রহী বলে মানুষ মনে করে। ফলে যথার্থ নির্বাচনী প্রক্রিয়া বিকাশ লাভ করছে না।

৫.৬ আদর্শিক দোদুল্যমানতা ঃ

বাংলাদেশে অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আদর্শিক দোদুল্যমানতায় ভোগেন। তারা যে নীতি গ্রহণ করেন আনুষ্ঠানিকভাবে, কখনো কখনো তা থেকে বিচ্যুতি গ্রহণ করেন আনুষ্ঠানিকভাবে, তা তারা নিজেরাও ভেবে দেখেননা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কখনো সচেতনভাবে, কখনো আবেগে, আবার কখনো কোনো আদর্শ বা কখনো নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছে। এক্ষেত্রে ধরন, দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশলের পার্থক্য থাকলেও একই ভূমিকা পালন করেছেন অনেকেই।

এখনো অনুরূপ ভূমিকার অবতীর্ণ রয়েছে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের প্রায় অধিকাংশ নেতা। সব বিষয়ে নেতার সিদ্ধান্ত অমর বাণী হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং ফলশ্রুতিতে সামগ্রিক ভাবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত হয়েছে নেতার আজ্ঞাবহ একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে। বাংলাদেশের সর্বত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বে একই ধারাবাহিকতা প্রবলভাবে অব্যাহত রয়েছে ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য আরো যেসব সাধারণ প্রবণতা দেখা যায় তা হলো ঘন ঘন দল পরিবর্তন, কর্তৃত্ব পরায়ণতা, চারিত্রিক দুর্বলতা ও দুর্নীতি পরায়ণতা, বহিঃশক্তির নির্ভরতা, অযোগ্যতা, মধ্যবিত্ত সুলভ আপোসকামী মানসিকতা প্রভৃতি। ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এবং রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকারিতা হারিয়ে ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও স্থবির হয়ে পড়েছে। এ সংকট নিরসনের জন্য প্রয়োজন রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলন যার মাধ্যমে বিকশিত হবে দৃঢ় চেতনা, দক্ষ ও প্রজ্ঞা সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব। একমাত্র সৎ, দক্ষ ও যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বই বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রকে তার সমৃদ্ধির লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

৫.৭ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব ঃ

বাংলাদেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশ্বাস যোগ্যতার অভাবের ফলে গণতান্ত্রিক চর্চা ব্যাহত হয়। ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ে সকল নির্বাচনেই সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন দলসমূহ ব্যাপক কারচুপি করেছে। ভোট চুরির প্রকৃতি একেক সরকারের একেক রকম ছিল। সামরিক শাসনামল কিংবা সামরিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সকল নির্বাচনই ছিল প্রহসন। কেননা, সামরিক শাসন ও নির্বাচন এ দুটো পরস্পর বিরোধী।
পরবর্তীতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার মাধ্যমে দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ কিছুটা হলেও নিশ্চিত হবে বলে আশা ছিল। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিকল্পনার জন্য

সংবিধানের ১৩তম সংশোধীনতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের কথা বলা হয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের দাবি জোড়ালো হয়ে উঠে।

বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন কমিশন স্বাধীন সাংবিধানিক সংস্থা, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। দেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে ২৯ জানুয়ারি ২০০৮ খ্রি উপদেষ্টা পরিষদে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে গঠনের অধ্যাদেশ অনুমোদন করে। অধ্যাদেশটি রাষ্ট্রপতির আদেশ জারি করে আইনে প্রণীত হয়।

অধ্যাদেশ অনুসারে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় সরকারের কোনো মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের আওতাধীন থাকবে না। নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত, সীমানা নির্ধারণ, ফলাফল সংগ্রহের যাবতীয় কাজ করে এ সচিবালয়।

এর ফলে দেশে নির্বাচন অনেক স্বচ্ছ ও অবাধ হবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো নির্বাচন কমিশনের উপর প্রশাসনের হস্তক্ষেপ সবসময়ই ছিল। উদার গণতান্ত্রিক চর্চার অনুপস্থিতির কারণে এমন হয়।

৫.৮ রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ ঃ

এ দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ লোক গ্রামে বসবাস করেন। তারা বেশিরভাগই কৃষিজীবী। তারা অনেকটাই আত্মকেন্দ্রিক এবং নিজেদের নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া তারা অর্থনৈতিক ভাবে অনেক দুর্বল বিধায় সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্র সম্পর্কে তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

আমাদের দেশের স্থানীয় কাঠামো এবং প্রশাসন গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপকতা লাভ করেনি। ফলে জনগণ রাজনীতিতে তেমন অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় না এবং তারা ৫

বছরে একবার ভোট দেয়াটাকেই তাদের দায়িত্ব মনে করেন। সরকার পক্ষ থেকে গ্রামীণ জনগণকে সচেতন করার জন্য তেমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়না। ফলে মানুষ রাজনীতি সচেতন হচ্ছেনা। নির্বাচন সম্পর্কে তাদের ধারণাও স্বচ্ছ নয়।

আবার রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্নীতি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংকট ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, সামজিক নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন কারণেও শহরের মানুষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। যদিও সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা পালন করছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। তাই নির্বাচন ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর ও বাস্তব সম্মত করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দিন দিন তাই ভোট দানের প্রতি জনগণের অনীহা বাড়ছে।

৫.৯ রাজনৈতিক দলের সংকীর্ন ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকে রাজনৈতিক দলসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলোর যে আদর্শিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ছিল এখন তা অনেকটাই ম্লান। আগে জনগণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো পরিচালিত হতো বর্তমানে এই মূল্যবোধের অভাব খুবই কম লক্ষ্যণীয়। রাজনৈতিক দলগুলো মাঝে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সমন্বয়ের অভাব, সহনশীলতাহীনতা, ক্ষমতা লিপ্সা, বিরোধীদলের প্রতি কাঠোর মনোভাব, সর্বোপরি অগণতান্ত্রিক চর্চা বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া অনেক রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো নিবন্ধন নেই, নির্বাচনী ইশতেহারে তোয়াক্কা নেই। তারা নেতা / নেত্রীর হুকুমই সব মনে করে। এখানে স্থানীয় পর্যায় থেকেই কর্তৃত্ব ও নেতা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ নেই বলেই চলে। সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের তথা দলের একজন নেতার কাছে কুক্ষিগত থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোতে পরিবারতন্ত্র ব্যাপক রূপলাভ করেছে। সকল ক্ষমতা একটি পরিবারের মাঝেই আবদ্ধ থাকে। এগুলো আমাদের রাজনৈতিক দলের

সাধারণ চিত্র। রাজনৈতিক দলগুলোতে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে যথাযথ নির্বাচনী সংস্কৃতি গড়ে তোলা সম্ভব।

৫.১০ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালীন অনিয়ম ঃ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী আইন লংঘন খুব সাধারণ ঘটনা। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তেমন কোন তৎপরতা চোখে পড়ে না। সব দলের প্রার্থী ও নেতা কর্মীরা সমানভাবে নিরাপত্তা পায় না। নির্বাচনী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক কার্যক্রমের অভিযোগ পাওয়া যায়। প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশে বাঁধা একটি সাধারণ ঘটনা। ভোটের দিন বুথ দখল, প্রকাশ্যে সিল মারা, জাল ভোট প্রদান, সাংবাদিক ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বাঁধা দান, প্রতিপক্ষের ভোটারদের হুমকি বা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেয়া, ভোট ক্রয় এসব অনিয়ম নিয়ে অসংখ্য অভিযোগ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এগুলো সবই সুষ্ঠু নির্বাচনের অন্তরায়।

আমরা সকলে যদি সম্মিলিত ভাবে ব্যক্তিস্বার্থ, গোষ্ঠীস্বার্থ ও দলস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশ ও জাতির স্বার্থকে একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে কাজ করি তবেই শুধু এর সমাধান সম্ভব। আর আমরা যদি এতে ব্যর্থ হই, ভবিষ্যৎ নিশ্চিত অন্ধকার। এ জন্যই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গটি বারবার উঠে আসে। এ জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ঐক্যমত, উদার গণতান্ত্রিক চর্চা ও অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধা। সংস্কার কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়, সবাইকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

৫.১১ তথ্যপুঞ্জী ঃ

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা, ২০১৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত পৃ. ৪

২. দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ জানুয়ারি ২০০৭

৩. জগলুল, আল. (১৯৯০). *বাংলাদেশ বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-৮৯*. প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা.পৃ. ৮৬

৪. এ ধরনের অভিযোগকারীদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামীলীগের তদানীন্তন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক যথাক্রমে আবদুল মালেক উকিল, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ, মুসলীম লীগ নেতা খান এ, সবুর, আওয়ামীলীগ (মিজান) এর সভাপতি মিজানুর রহমান চৌধুরী, এবং জাসদের শাজাহান সিরাজ। দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক ১৯শে এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯

৫. সাপ্তাহিক রোববার, ১১ মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-১১

৬. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ই, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২০

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২১

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২০

৯. এ তিনজন ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন, লর্ড এ্যানালস, মার্টিন ব্রাউন ব্রাভো (এমপি) ও বিবিসি'র ডেভিডজনলে।

১০. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা- ২৩, ২৪ ও ২৭

১১. এ সকল বিদেশি সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলেন, লস এ্যাঞ্জেলস পত্রিকার সংবাদদাতা বন টেমেষ্ট, টাইমস পত্রিকার মাইকেল হ্যামিলন, ফিনানসিয়াল টাইমস এর জন এলিয়ট, গার্ডিয়ান পত্রিকার এরিখ সিলভার, নিউয়র্কটাইমস এর ষ্টিফেন আর, ওয়াইজম্যান প্রমূখ।

১২. এ সম্পর্কিত মার্ক টালীর প্রতিবেদন বিবিসি থেকে ৭ মে, ১৯৮৬, রাতে প্রচারিত হয়।

১৩. সাপ্তাহিক রোববার, ১০ মে, ১৯৮৬, পৃ. ১১

১৪. ১৯৮৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নির্বাচন না বলে বুথ দখলের খেলা' হিসাবে বর্ণনা করা হয়। দেখুন সাপ্তাহিক রোববার, ১১ মার্চ, ১৯৮৮, পৃ. ৯

১৫. সাপ্তাহিক রোববার, ৬ মার্চ, ১৯৮৮, পৃ. ১৫-১৬

১৬. *দৈনিক যুগান্তর*, ৭ জানুয়ারি ২০২৪

১৭. BBC NEWS বাংলা, https://www.bbc.com/bengali/articles/clkjw8k1773o

১৮. BBC NEWS বাংলা, https://www.bbc.com/bengali/articles/clkjw8k1773o

১৯. BBC NEWS বাংলা, https://www.bbc.com/bengali/articles/clkjw8k1773o

২০. BBC NEWS বাংলা, https://www.bbc.com/bengali/articles/clkjw8k1773o

২১. BBC NEWS বাংলা, https://www.bbc.com/bengali/articles/clkjw8k1773o

২২. BBC NEWS বাংলা, https://www.bbc.com/bengali/articles/c973ldzq4gdo

২৩. প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০০৭

২৪. Hariharan, A. India, A Common Goal: Get Rich Quick" *Far Eastern Economics Review* 85,35 6th September, 1974 পৃঃ ২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন

৬.১ গণতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থার গুরুত্ব ঃ

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ নির্বাচন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিফলন হয় যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচন এর মাধ্যমে। নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকগণ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন। তাই প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা। নির্বাচন হল গণতন্ত্রের ভিত্তি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে আইন সভার প্রতিনিধি ও শাসন কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ তাদের পক্ষে আইন প্রণয়ন করে ও শাসন কার্য পরিচালনা করে। গেটেলের মতে, "গণতন্ত্র হল সেই ধরণের সরকার ব্যবস্থা যেখানে জনসংখ্যার ব্যাপক অংশের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগে অংশীদার হওয়ার অধিকার আছে।"[১] যা গণতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্ট করে। কারণ নির্বাচনের মাধ্যম শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক যোগযোগ গড়ে উঠে। সিদ্ধান্তকারীকে নির্বাচক মন্ডলীর দাবিসম্পর্কে সচেতন করে তোলে। আর তাই এভাবেই রাজনৈতিক বিষয়ে নির্বাচক মন্ডলী শিক্ষিত হয়ে উঠে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জনগনের রাজনৈতিক যোগাযোগের এক ব্যাপক সুযোগের সৃষ্টি হয়। তাই অধ্যাপক বলের অভিমত, যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অধিকাংশ নাগরিকের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ গ্রহণের একমাত্র উপায় হল এ নির্বাচন।[২] নির্বাচনের বিশুদ্ধতা গণতন্ত্রের নিয়ামক। তাই গণতন্ত্রে নির্বাচন অনেক গুরুত্বপূর্ণ। Elections are windows in a society. A free and fair election is the prerequisite to set for the parliamentary system of government. In any modern democratic political system Parliament is considerd as the hub of people's voice.[৩]

৬.২ নিরক্ষেপ নির্বাচন ঃ

গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন অপরিহার্য। কারণ এর মাধ্যমে জনমতের প্রতিফলন ঘটে। নির্বাচন শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে মনোনয়ন, বাছাই বা নিজের শ্রেষ্ঠ মতকে প্রতিষ্ঠিত করা, নির্বাচন কোন প্রতিষ্ঠান বা দপ্তরের কোন পদে প্রার্থীদের মধ্য থেকে এক বা একাধিক প্রার্থীকে বাছাই প্রক্রিয়া, যেমন : সরকার, আইন সভা এবং বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলিতে নির্বাচক মন্ডলী কতৃক প্রকাশ্য বা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়।[৪] বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব ব্যবস্থায় 'নির্বাচন' শব্দটির পূর্বে একটি লুকায়িত প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি হয় তা হলো 'নিরপেক্ষ'। মানব সভ্যতার বিকাশের ফলে জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার, উন্নত সামরিক জোট, প্রশাসন যন্ত্র, ক্ষমতার দাপট, শক্তিশালী মিডিয়া, ইত্যাদি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সে 'নিরপেক্ষতা' কে চ্যালেঞ্জের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বর্তমান সময়ে বিষয়টি আরো বেশি প্রাসঙ্গিক।

নিরপেক্ষ নির্বাচন বলতে পক্ষপাতহীন, শান্তিপূর্ণ, অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বুঝায়। অর্থাৎ নির্বাচন পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কোনরূপ পক্ষ সমর্থন না করে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে একটি নির্বাচন পরিচালনা করবে। এখানে প্রশাসন যন্ত্র থেকে শুরু করে নির্বাচন পরিচালনার সাথে জড়িত সকলে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। নির্বাচনকালীন প্রশাসন দলীয় সরকারের নাগালের বাইরে থাকবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিরোধীদলসহ সমগ্র নির্বাচকমন্ডলী যেন ভয়ভীতিহীনভাবে তাদের পছন্দনীয় প্রার্থীকে ভোট প্রদান করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকতে হবে। কোন কিছুই যেন নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে না পারে। যে সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে এবং জনস্বার্থে আইন প্রণয়ন করবে, নিরপেক্ষতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের মাধ্যমেই কেবল পরবর্তী নির্বাচনে তাদের নির্বাচন করা হবে। নির্বাচন নিরপেক্ষ না হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা গণতন্ত্রের চারণ ভূমি হিসেবে মনে করি। সেখানেও ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নিরপেক্ষ নির্বাচনকে কলঙ্কিত করে তুলেছিল। দেশটিতে নির্বাচনে ক্ষমতার দাপট ও পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগ উঠেছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর উপর হামলাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। তারপরও সহনশীলতা প্রদর্শন করে মেনে নেয় মার্কিন জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু হাজারো সমস্যায় জর্জরিত তৃতীয় বিশ্বে নিরপেক্ষতার প্রশ্নটি আরো জটিল। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা, শিক্ষার অনগ্রসরতা, দুর্বল প্রশাসন যন্ত্র, ঔপনিবেশিক ধাচের আমলাতন্ত্র, দুর্নীতি; নির্বাচন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের একটি পন্থা হল নির্বাচন।[৫] বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা প্রশ্ন। প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে সৃষ্টি হয় জনমনে আতঙ্ক। পরাজিত পক্ষ নির্বাচনকে মেনে নিতে চায় না। তাই নাগরিক সমাজ, রাজনৈতিক দল, সিভিল সোসাইটি ও উন্নয়ন সহযোগীদের পক্ষ থেকে সংস্কারের কথা আসছে। আমরা সবাই চাই বাংলাদেশে গণতন্ত্র দৃঢ় ভিত্তির উপর হবে। আমাদের গণতন্ত্র কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবেনা, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত সকল জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলো বৈধতার প্রশ্নে সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়নি। যদি আশির দশকের কথা বলি, খুব কম সংখ্যক ভোটার ভোট দিতে পারত। তাই কেউ ভোট কেন্দ্রে যেতে আগ্রহ দেখাত না। সে সময় পত্র পত্রিকায় এ রকম সংবাদও বেরিয়েছে যে, মৃত লোকেরও ভোট দেয়া হয়েছে। এমনকি একটি কেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যার চেয়েও বেশি ভোট কাষ্ট হয়ে গেছে। কালো টাকা ও পেশি শক্তির প্রভাব ছিল একচেটিয়া। সরকারি ক্ষমতায় থাকা দলের প্রভাব ছিল সীমাহীন। সরকারি অর্থ, যানবাহন বেপোরোয়া ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য শুরু হয় সংস্কার আন্দোলন। তারই ধারাবাহিকতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারসহ নানা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। সময়ের পরিক্রমায় এ ব্যবস্থাও হয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ। অর্থাৎ “নিরপেক্ষ নির্বাচন” কথাটি বারবার উচ্চারিত হয়েছে। নির্বাচন নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের জন্য একটি অত্যাবশকীয় কর্মসূচী। নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ তাদের রায় দিতে পারে এবং একটি

দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠনের বৈধতা পায়। কিন্তু নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য হলেও সব নয়। নির্বাচন অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু, অবাধ ও স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচন অনুষ্ঠান। নির্বাচন নিরপেক্ষ না হলে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে না তাদের পক্ষে নির্বাচনের রায় মেনে নেয়া কঠিন হয়। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভকারী দল বিরোধী দলকে যথাযথ সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্টতা পায়নি বলে তাকে হেয় করা যাবে না। এর অন্যথা হলে নির্বাচনের পর রাজনীতিতে অস্থিরতা হয়ে উঠবে অনিবার্য। বাংলাদেশের গণতন্ত্র চর্চায় যদি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠা যায় তবে তা বিশাল পরিবর্তন এনে দিবে। আর এটাই হলো সংস্কার। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে নির্বাচন হতে হবে নিরপেক্ষ। আলোচ্য গবেষণায় এ বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে। আমরা চাই নির্বাচন হবে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও উৎসবমুখর।

৬.৩ নির্বাচনী সংস্কার ঃ

'সংস্কার' অতি পরিচিত একটি শব্দ। সংস্কার অনেক ধরনের অর্থ নির্দেশ করে যেমন শুদ্ধি, পরিষ্করণ, মার্জন, ভুল সংশোধন। অবিধানে, 'সংস্কার' শব্দের সাতাশটি ভিন্ন অর্থ ও প্রয়োগ দেখিয়েছে। এর মধ্যে অনেক প্রয়োগই প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যজাত। সে অর্থ থেকে অনেক সরে এসেছে আধুনিক প্রয়োগ। এখানে সংস্কার বলতে যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো পরিপাটিকরণ, পরিষ্করণ, ক্ষালন, শুদ্ধি বা শোধন ইত্যাদি অর্থে প্রযোজ্য।[৬]

বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতিতে 'সংস্কার' শব্দটি স্থান করে নিয়েছে। একে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। অবিধান অনুযায়ী আমাদের রাজনীতিতে বর্তমানে যে সংস্কার বিতর্ক চলছে তার প্রয়োগ মূলত শুদ্ধি বা সংশোধন নির্দেশ করে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কার্যকর করার লক্ষ্যে নির্বাচনী সংস্কার প্রসঙ্গ এসেছে। নির্বাচন ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতির কারণে নির্বাচন হচ্ছে প্রশ্নবিদ্ধ। ফলে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সৃষ্টি হয়

রাজনৈতিক সংকট। গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচনই সব কিছু নয় এ কথা সত্যি হলেও নির্বাচন দিয়েই এর যাত্রা শুরু। সংস্কার মানে ব্যবস্থার পরিবর্তন। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চর্চায় প্রধান সমস্যা হলো সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকতা। তাই সুষ্ঠু, যথার্থ ও অর্থপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি এসেছে। দাবি এসেছে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির কাছ থেকেও। সচেতন প্রতিটি নাগরিকই দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীতা অনুভব করে।

৬.৪ সংস্কার আন্দোলন ঃ

সংস্কার আন্দোলন হলো ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য এক ধরনের প্রগতিশীল প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের চাকা সচল রাখার জন্য সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন একটি গণ দাবি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হতেও তা উচ্চারিত হয়েছে। সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকেও নানা প্রস্তাব আসছে। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রোধ, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির চর্চা, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের আন্দোলন তৎপরতা পরিচালিত হচ্ছে। যার শুরু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তীতে ২০০৬-২০০৮ সালের দিকে তা আরো ব্যাপকতা লাভ করে। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাও হয়েছে প্রশ্নবিদ্ধ। নির্বাচন ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চেয়ে অন্যান্য বিষয়ে তাদের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করেছে। সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক সংকট।

নির্বাচনী আচরণ বিধিমালাগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠানে তেমন কার্যকর হচ্ছিল না। অসৎ প্রার্থীগণ নিবাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেন। আইনের ফাঁক দিয়ে তারা নিস্তার পেয়ে যান। ফলে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ হ্রাস পেয়ে যায়। প্রয়োজন হয় নির্বাচনী আচরণ বিধির পরিবর্তন। সংস্কার করে কঠোর নির্বাচন আচরণ বিধি প্রণয়ন এবং তা পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করার উপর জোড়

প্রদান করা হয়। ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রণয়নের কারণে ভোটার তালিকায় সংশোধন এসেছে। বিগত নির্বাচনগুলোতে ভোটার তালিকা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। ফলে জনমনে ক্ষোভ ছিল। নির্বাচনী কেন্দ্র দখল ও জালভোট প্রদানের সংস্কৃতি গড়ে উঠায় নির্বাচনী সন্ত্রাস ব্যাপক আকার ধারণ করে। নির্বাচনী ব্যয়ের উপর নির্বাচন কমিশনের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার ছিল একটি সাধারণ বিষয়। ফলে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচনে আসার আগ্রহ কমে যায়। এছাড়া নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর অন্যতম কারণ নির্বাচন কমিশনের দূরাবস্থা। অবস্থা এমন হয় যে, নির্বাচন কমিশনই যেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের অন্তরায়। তাই সকল মহল থেকে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠনের কথা আসতে থাকে। সংস্কার নিয়ে দেশজুড়ে শুরু হয় তোলপাড়। আবার সংস্কার যেন দুর্বৃত্তায়নের হাতিয়ার না হয় সেদিকে জনগণকে সচেতন থাকতে হয়। নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এ আন্দোলন সফল হবে না।

৬.৫ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার প্রসঙ্গে এফপিটিপি ও পিআর পদ্ধতিঃ

নির্বাচন পদ্ধতি হল একটি গণতান্ত্রিক দেশের জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা। এটি সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি দেশের মতো বাংলাদেশেও একটি নির্বাচন পদ্ধতি রয়েছে। যার উদ্দেশ্য হলো সকল দলের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটানো। নির্বাচনের যে পদ্ধতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কয়েক শতাব্দী ধরে অনুসৃত হয়ে আসছে তা হলো সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি বা First Past The Post (FPTP)। বাংলাদেশেও জাতীয় সংসদ নির্বাচন সহজ সংখ্যাধিক্য বা ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়।[৭] এ পদ্ধতিতে প্রতিটি সংসদীয় এলাকায় একাধিক প্রার্থীর মধ্যে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পান তিনিই নির্বাচিত হন; এক ভোট বেশি পেলেই তিনি হন ঐ এলাকার জনপ্রতিনিধি।

এ পদ্ধতিতে শতকরা হারে মোট ভোটারের নগণ্যসংখ্যক ভোট পেয়েও জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ হয়ে যায়। অন্যদিকে জাতীয়ভাবে বেশি ভোট পেয়েও কোনো দল সরকার গঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে পারে।[৮] বিভিন্ন দুর্বলতার পরও নির্বাচনের 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' পদ্ধতি বহু দেশে প্রবর্তিত হয়েছে।[৯]

বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রচলিত ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতি নিয়ে বিভিন্ন গবেষক, রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ প্রশ্ন তুলেছেন। দেশের গণতন্ত্রকে আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালী করা যেহেতু জনগনের দাবি, তাই আধুনিক নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তনের পক্ষে দাবি উত্থাপিত হচ্ছে। কারণ, দীর্ঘদিন থেকে হয়ে আসা বর্তমান নির্বাচনের প্রচলিত পদ্ধতির প্রতি জনগণ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

বর্তমান বিশ্বে একটি আধুনিক নির্বাচন পদ্ধতির নাম সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি। ইংরেজিতে যাকে Proportional Representation বা PR সিস্টেম বলা হয়।[১০] নির্বাচন ব্যবস্থা হিসেবে 'আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি', 'সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি' পদ্ধতির চেয়ে উন্নত এ কথা বলা যায়। তা না হলে উন্নত বিশ্বের ৭০ শতাংশের বেশি দেশ এ পদ্ধতি অনুসরণ করত না। আগে যেসব উন্নত দেশ 'সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি' পদ্ধতির নির্বাচন অনুসরণ করত, সেগুলো (যেমন নিউজিল্যান্ড) ক্রমেই 'আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি' গ্রহণ করেছে।[১১]

সংখ্যানুপাতিক বা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির নির্বাচনে একটি দল যত শতাংশ ভোট পাবে, সে অনুপাতে তারা সংসদের আসন পাবে। আনুপাতিক পদ্ধতির দুটি মডেল আছে। আধুনিক মডেলে প্রার্থীদের নাম দল আগাম ঘোষণা করে ব্যালটভুক্ত করা হয়। পুরোনো ও অপরিপক্ব মডেলে দলকে ম্যান্ডেট দেয়া হয়। অনেকে মনে করেন শুধু দলের নাম ও প্রতীকের ভিত্তিতে ভোট এবং প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে ভাগে পড়া আসনগুলোয় দলীয় প্রধান বা দলের কেন্দ্রীয় মনোনয়নে সংসদ সদস্য নির্বাচন হয়। আনুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা পরিপক্ব হয়েছে বিগত কয়েক দশকে। নেদারল্যান্ডসের

ভোটার শুধু দলকে নয়, বরং সারা দেশের সব দলের সব প্রার্থীর মধ্যে দলের প্যানেলের (দলের নামের নিচে প্রার্থীদের নাম থাকে ব্যালটে) শুধু একজন প্রার্থীকে ভোট দেন। একটি দলের সব প্রার্থীর প্রাপ্ত মোট জাতীয় ভোটের শতাংশের বিপরীতে ওই দলের সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীরা মনোনীত হন। এর মাধ্যমে দলের বা দলীয় প্রধানের স্বৈরতন্ত্র প্রতিহত করা হয়। পিআর ব্যবস্থায় স্থানীয় কোনো আসন থাকে না। এক ব্যক্তি সারা দেশের একজনকে মাত্র ভোট দেন। দলের ভেতর যাঁরা সর্বোচ্চ ভোট পান, তাঁরা দলের প্রাপ্ত শতাংশের মধ্যে সিলেক্টেড হন।[১২] অনেক দেশে আনুপাতিক নির্বাচনে সংসদে আসন পেতে ন্যূনতম ৩ শতাংশ ভোট পাওয়া লাগে। এ বিষয়টি রাষ্ট্র ভেদে ভিন্ন হতে পারে।

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয় ব্যক্তি-প্রার্থীর পরিবর্তে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে। ৩০০টি কনস্টিটুয়েন্সি থাকবে না। বাংলাদেশ হবে একটি একক কনস্টিটুয়েন্সি। নির্বাচনে যে দল মোট প্রদত্ত ভোটের যত শতাংশ পাবে সে অনুপাতে সংসদে আসন লাভ করবে। যেমন 'ক' দল মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশ ভোট পেলে আসন পাবে ৫০□৩ =১৫০টি, 'খ' দল ৪০ শতাংশ ভোট পেলে আসন পাবে ৪০□৩ =১২০টি, 'গ' দল ৫ শতাংশ ভোট পেলে আসন পাবে ৫□৩ =১৫টি এবং 'ঘ' দলও ৫ শতাংশ ভোট পেলে আসন পাবে ৫□৩ =১৫টি। এভাবে সংসদের ৩০০টি আসন পূরণ হবে। কোনো একটি দল শূন্য দশমিক ৩৪ শতাংশ ভোট পেলে তার আসন হবে মাত্র ১টি। ১৮৯৯ সালে বেলজিয়াম এ পদ্ধতিটি প্রথম প্রবর্তন করে। অধুনা বিশ্বের প্রায় ১০০টির অধিক দেশ কোনো না কোনো প্রকারের পিআর পদ্ধতি অনুসরণ করছে।[১৩]

নির্বাচনের আগেই প্রতিটি দলকেই প্রার্থী তালিকা নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়াসহ প্রকাশ করতে হয়। যে দল আনুপাতিক হারে যতটি আসন পাবে, তালিকার প্রথম থেকে শেষ, এ ধারাবাহিকতায় তা পূরণ হবে। বিদ্যমান ব্যবস্থায় (FPTP)-এ, একটি রাজনৈতিক দল ২২ শতাংশ ভোট পেয়ে এবং অবশিষ্ট ৭৮ শতাংশ ভোটারের সমর্থন

ব্যতিরেকেই সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করতে পারে। পিআর পদ্ধতিতে এটি কখনোই সম্ভব হবে না। বিদ্যমান পদ্ধতিতে ৬০ শতাংশ ভোটারের সমর্থন ছাড়া কেবল ৪০ শতাংশ ভোটারের সমর্থনেই ৩০০টি আসন পূরণ সম্ভব। পিআর পদ্ধতিতে ১০০ শতাংশ ভোটারের সমর্থনে সরকার গঠিত হোক বা না হোক, ১০০ শতাংশ ভোটারের সমর্থনেই সংসদ গঠিত হবে। উল্লেখ্য, কোনো কোনো দেশে 'ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট' এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচন পদ্ধতির সমন্বয়ে মিশ্র পদ্ধতির নির্বাচনব্যবস্থা চালু রয়েছে, যেমন নেপাল।[১৪]

প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা পিআর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো অত্যন্ত আধুনিক ও বাস্তব সম্মত। একারণেই এর গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বাড়ছে। নিম্নে পিআর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা হলো-

১. যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠের (৫০ শতাংশের অধিক) ভোট পায়, তারাই সরকার গঠন করে;

২. দলভিত্তিক জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় বলে প্রতিটি দলকে দলীয় নীতি-আদর্শ ও কর্মসূচির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হয়। এখানে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যক্তির বদলে দলীয় নীতি-আদর্শ ও নির্বাচনী ইশতেহার বেশি গুরুত্ব পায়। ফলে ক্রমেই সুস্থ রাজনীতি চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক;

৩. এ পদ্ধতিতে কোনো প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা থাকবে না, ফলে এলাকাভিত্তিক জয়ের প্রচেষ্টা হ্রাস পাবে, নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ, সহিংসতার সম্ভাবনা হ্রাস পাবে;

৪. স্থানীয় কর্মকান্ডে সংসদ-সদস্যদের অযাচিত হস্তক্ষেপ হ্রাস পাবে। অন্যদিকে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী হবে;

৫. বর্তমান ব্যবস্থায় দল যদি সংখ্যালঘুকে মনোনয়ন না দেয়, সংখ্যালঘুর পক্ষে সংসদে এমপি হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আনুপাতিক নির্বাচন এ সমস্যার সমাধান দেয়;

৬. এখানে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করার জন্য নির্বাচনী কর্মকর্তা, পুলিশ কিংবা প্রশাসনকে পক্ষে টানা সম্ভব হয় না। আমাদের দেশে বর্তমানে যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাতে এ বিষয়ের অনেক দুর্নীতির সংবাদ পাওয়া যায়;

৭. পিআর পদ্ধতিতে প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে উপনির্বাচনের প্রয়োজন হয় না। যা আমাদের মত দেশে অনেক অর্থের সাশ্রয় করবে;

৮. এ পদ্ধতিতে নমিনেশন দাখিল কেন্দ্রীয়ভাবে হবে, তাই নারীর সংরক্ষিত আসনে ভিন্নভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজন হবে না। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে আইন দ্বারা বাধ্য করা হবে যে, নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের পক্ষে দাখিলকৃত তালিকায় নির্দিষ্ট অনুপাতে নারী প্রতিনিধিত্ব রাখবে;

৯. পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনী ব্যয় অনেক হ্রাস পাবে;

১০. এ পদ্ধতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আগ্রহী রাজনৈতিক দল প্রার্থীদের তালিকা ওপেন লিস্ট বা ক্লোজড লিস্ট আকারে নির্বাচন কমিশনে দাখিল করতে পারবে। ওপেন লিস্টে ভোটার এবং দলের সদস্যরা আগেই জেনে যাবেন দলের প্রার্থী কারা। এর ভালোমন্দ উভয় দিকই আছে। জনগণের জন্য ভালো, তারা প্রার্থীদের গুণাগুণ আগাম বিশ্লেষণ করে দলের সক্ষমতা নির্ধারণ করতে পারবেন। ক্লোজড লিস্টের সুবিধা হচ্ছে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার আগে দলের প্রার্থী কারা ছিলেন তা গোপন থাকবে। ফলে দলের ভেতর সম্ভাব্য কোন্দল বা রেষারেষি পরিহার করা সম্ভব হবে। নির্বাচন সহজ, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ হবে।[১৫]

প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন বা পিআর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো অত্যন্ত আধুনিক হলেও এর অনেক সমালোচনা রয়েছে, যে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাবার সুযোগ নেই। আমাদের দেশে মানুষ এ পদ্ধতিটির সাথে পরিচিত নয়। ভোটারগণ প্রচলিত পদ্ধতিটিতে অনেক

যুগ ধরে অভ্যস্ত ও এটি বহুল প্রচলিত। অন্যদিকে পিআর পদ্ধতি নতুন। এখানে পিআর পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমস্যা তুলে ধরা হলো-

১. বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতিতে কোনো দলের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থাৎ ১৫০টির বেশি আসন লাভ করে এককভাবে সরকার গঠন করা কঠিন। এ ক্ষেত্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে হবে;

২. দলের ভেতরে এতে অনাকাঙ্খিত কোন্দল-রেষারেষি হতে পারে। দলে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকলে দলীয় নেতার স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে;

৩. স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচন করার সুযোগ থাকে না;

৪. কোয়ালিশন সরকার গঠন সম্ভব না হলে তাৎক্ষণিক সংসদ ভেঙে না দিয়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক আসনপ্রাপ্ত দলকে অবিলম্বে সরকার গঠনের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। এতে শূন্যতার তাৎক্ষণিক সংকট পরিহার করা যাবে। সংখ্যালঘু দল কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে না পারলে ২-৩ বছর পর একই পদ্ধতিতে আবার সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করা যেতে পারে। সাময়িক এমন ব্যবস্থা সংবিধান বা যথোপযুক্ত আইনি বিধান দ্বারা করা যায়।[১৬]

৫. দলকে ভোট দিলে দল বা তার প্রধান একক সিদ্ধান্তে সব সংসদ সদস্য নির্বাচন করে বিপর্যয় তৈরির বহু উদাহরণ বিশ্বে রয়েছে। অপরিপক্ব সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থার দেশগুলো তাই পিআর নিয়ে কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিপদে আছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার প্রসঙ্গে বর্তমানে পিআর পদ্ধতিটি আলোচনায় আসছে। সবাই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কামনা করে। জাতি নির্বাচন নিয়ে কোন সংঘাত চায় না। এ জন্য নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার প্রসঙ্গে দেশের সংসদ নির্বাচনে 'আনুপাতিক নির্বাচন' পদ্ধতি কে 'সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি' পদ্ধতির বিকল্প হিসেবে আলোচনায় আসছে। আনুপাতিক নির্বাচন নিয়ে ছোট ছোট দলগুলো যতটা আগ্রহী, বৃহৎ রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে তার বিপরীত আচরণ লক্ষ করা যায়। আবার রাজনৈতিক দলগুলো ঐক্যমতে না পৌঁছালে তা বাস্তবায়ন কঠিন।

৬.৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইন[১৭] ঃ

সারণি: ৬.১

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইন

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইন	
ক্রমিক	শিরোনাম
১	THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ORDER, 1972 [আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েব সাইট (www.legislativediv.gov.bd) থেকে ১৭-১০-২০২৩ তারিখ সংগৃহীত]
২	THE MEMBERS OF PARLIAMENT (DETERMINATION OF DISPUTE) ACT, 1980
৩	THE MEMBERS OF PARLIAMENT (DETERMINATION OF DISPUTE) ACT, 1980 (ACT NO. I OF 1981)
৪	জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন ২০০৪
৫	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ (সংশোধনী)
৬	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮
৭	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (প্রতীকসমূহ) (১৬-০২-২০১৭)
৮	পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ (সংশোধনী)
৯	রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা, ২০০৮ (সর্বশেষ সংশোধনীসহ)
১০	সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (২৪-১১-২০১৩)
১১	সংসদীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮
১২	THE DELIMITATION OF CONSTITUENCIES ORDINANCE, 1976

১৩	Representation of the People (Amendment) Ordinance, 2018 (৩১-১০-২০১৮)
১৪	রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (৩১-১০-২০১৮)
১৫	স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা ২০১১
১৬	স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১ এর সংশোধনী (৩১-১০-২০১৮)
১৭	জাতীয় সংসদ নির্বাচন (ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন) বিধিমালা, ২০১৮ (৭-১১-২০১৮)
১৮	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (৭-১১-২০১৮)
১৯	জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের পুনঃনির্ধারিত সীমানার চূড়ান্ত তালিকার গেজেট
২০	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২
২১	জাতীয় সংসদের নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন ২০২১
২২	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন (২৩-০২-২০২৩)
২২	দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের নির্বাচনি এলাকার প্রাথমিক সীমানা পুনঃনির্ধারণ-২০২৩ এর গেজেট
২৩	আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের পুনঃনির্ধারিত সীমানার চুড়ান্ত তালিকার গেজেট বিজ্ঞপ্তি
২৪	জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে 'জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা"
২৫	Representation of the People (Amendment) Act, 2023 এর গেজেট
২৬	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধন সংক্রান্ত গেজেট (২৭-০৯-২০২৩)
২৭	জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন (সংশোধন) আইন, ২০২৩ এর গেজেট (18-09-2023)
২৮	জাতীয় সংসদ নির্বাচনি এলাকার সীমানা নির্ধারণ আইন, ২০২১ সংশোধন সংক্রান্ত গেজেট। (অধ্যাদেশ নং-২৩, ২০২৫)
২৯	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৫

৩০	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৫ (০১-০৯-২০২৫)
৩১	নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এর সংশোধনী (প্রতীক) ২৪-০৯-২০২৫
৩২	৩০০ আসনের প্রাথমিক তালিকার গেজেট ৩০-০৭-২০২৫
৩৩	৩০০ আসনের সীমানার চূড়ান্ত গেজেট ০৪-০৯-২০২৫

উৎসঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইট (৩-১০-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত),
https://www.ecs.gov.bd/page/national-parliament-election-law

৬.৭ সংস্কার প্রস্তাব ঃ

সংস্কার প্রস্তাব হলো নির্দিষ্ট কোন আইন, নীতি কিংবা প্রথা যা দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে তা আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব বা শুপারিশ। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নির্বাচনগুলোতে দুর্নীতির চর্চা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছে যে, জনসাধারণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নির্বাচনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। শিক্ষিত, সচেতন এবং বুদ্ধিজীবীগণ নির্বাচনকে গণ্য করেছেন প্রহসন রূপে। প্রতিটি নির্বাচনেই সরকারি দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী সন্ত্রাস সৃষ্টি ও ভোট কারচুপির অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে।[১৮] তাই, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপিত হচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান এবং তিনি না হলে সুপ্রীমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রধান বিচারপতি অথবা আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্য থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান বিচার বিভাগের রাজনীতিকরণ ও দলীয় করণের প্রবণতা সৃষ্টি করেছে।

বিচারকদের চাকরি বয়ঃসীমা ৬৫ থেকে ৬৭ তে আকস্মিকভাবে উন্নীত করায় তা আরও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নির্দলীয় সরকারের দায়িত্ব অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করা ও অর্ন্তবতীকালীন সরকার হিসেবে সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করা এবং প্রয়োজন ব্যতীত কোনভাবেই কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা। বাস্তবতায় দেখা যায় আইনগত ক্ষমতার বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কারের দাবি উত্থাপিত হয়। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো-

(১) রাষ্ট্রপতি সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যদের নিয়োগ দান করবেন।

(২) সংসদীয় ব্যবস্থার মত রাষ্ট্রপতি অন্তবর্তীকালীন সময়ে প্রধান উপদেষ্টার পরার্মশ অনুযায়ী কাজ করবেন।

(৩) প্রতিরক্ষা বিভাগ তত্ত্বধায়ক সরকারের অধীনে ন্যস্ত হবে।

(৪) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যপরিধি সংবিধান অনুসারে কেবল সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও সাধারণ নিবাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা প্রদানের মধ্যে সীমিত থাকবে।

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার ঃ

(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ রাজনৈতিক দল সমূহের সাথে আলোচনা ক্রমে সততা ও যোগ্যতার ভিতিত্তে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন।

(২) কমিশনারগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কাজ করবেন একাধিক মতের ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে।

(৩) নির্বাচন কমিশনের একটি স্বাধীন সচিবালয় থাকবে।

(৪) নির্বাচন কমিশন আর্থিকভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীন হবে।

(৫) নির্বাচন কমিশন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে।

(৬) নির্বাচনী আইন সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে।

(৭) নির্বাচনী আইন ও বিধি লংঘনের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা ও বাতিল করতে এবং প্রয়োজনে বিধি লংঘনকারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারবে। এ জন্য ঐ সময়ে নির্বাচন কমিশনকে বিচারিত ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

(৮) ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল হবে এবং ভোটারদের ছবি ও ভোটার নম্বর সম্বলিত পরিচয়পত্র দিতে হবে, যাতে ভোটের দিনে নির্বাচনী বুথ স্থাপন করতে না হয়। প্রবাসীদের ভোটার তালিকায় অর্ন্তভুক্তি এবং ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে সর্বদলীয় পর্যবেক্ষণ দল গঠন করতে হবে। নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে তালিকাভুক্তি করতে হবে এবং নির্বাচন তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সরবরাহ করতে হবে।

(১০) আর্ন্তজাতিক পর্যবেক্ষক দলের নাম ও নূন্যতম পক্ষে ভোট গ্রহণের একমাস আগে প্রকাশ করতে হবে এবং তাদের কার্য পরিধি ও নির্দিষ্ট থাকবে।

(১১) ভোট কেন্দ্রে সবার উপস্থিতিতে নির্বাচনী ভোট গণনা ও ফলাফলের স্বাক্ষরিত কপি প্রার্থী বা তার মনোনীত ব্যক্তিকে প্রদান করবে।

(১২) নির্বাচনী ফলাফলের বিরোধের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইবুনালে কোন মামলা দায়ে করা হলে দু'মাসের মধ্যে তার নিষ্পত্তি করা এবং সে সংক্রান্ত কোন আপিল সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বেঞ্চ কর্তৃক তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন নিজে পক্ষভুক্ত হয়ে মামলা নিষ্পত্তির ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

নির্বাচনী আইন ও বিধির সংস্কার ঃ

(১) নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস করা এবং এর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণঃ

(ক) প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য যারা যেভাবে ব্যয় করুন তা প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে। প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একজন নির্ধারিত কর্মকর্তা এই ব্যয় মনিটর করবেন এবং নির্বাচন কমিশনকে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করবেন। এই রিপোর্টের সঙ্গে প্রার্থীর দেয়া নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ মিলিয়ে দেখা হবে।

(খ) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার ১৫ দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রার্থী তার নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারিত ফরমে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে আইনে বর্ণিত শাস্তি (২-৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড) কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করতে উন্মুক্ত দলিল হিসাবে রাখতে হবে। প্রচার মাধ্যমে এবং নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইটে তা সরবরাহ করতে হবে। যেকোন ভোটার এ ব্যাপারে তাদের আপত্তি জানাতে পারবেন।

(ঘ) খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিলীকরণ করানো হলে খেলাপি কোন প্রাথী নির্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(ঙ) যথাযথ নিরীক্ষার পর অসত্য তথ্য প্রদানকারীদের নির্বাচন বাতিল হবে।

(২) প্রার্থীদের সম্পদ ও পরিচয় প্রকাশ ঃ

(ক) প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের আগে তার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ, কোন রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তার স্বার্থ জড়িত আছে কি না সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে হবে।

(খ) হাইকোর্ট যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী প্রার্থীদের শিক্ষাগত, অন্যান্য যোগ্যতা ও কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কি না, সে তথ্য সহ অন্যান্য তথ্য প্রার্থীর মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

(গ) নির্বাচন কমিশন এসব তথ্য জনগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা করবে যাতে ভোটারা প্রার্থীর যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্পর্কে অবগত থাকবেন।

(৩) প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ঃ

(ক) নিজে অথবা পরিবারের কেউ ঋণ খেলাপি হলে, কালো টাকার মালিক বলে বিবেচিত হবে।

(খ) সরকারি চাকুরি ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোন সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে না।

(গ) দলের মনোনয়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তৃনমুল থেকে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামুলক করা, মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য অর্থের লেনদেন রোধ করা।

(৪) রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ঃ

(ক) রাজনৈতিক দলসমূহর নিবন্ধন ও প্রতি দুই বছর পর নিবন্ধন নবায়ন আইনগত ভাবে বাধ্যতামুলক করতে হবে।

(খ) শুধূ নিবন্ধিত দলই নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারবে।

(গ) নিবন্ধনের শর্ত হবে দলীয় গঠনতন্ত্রের নির্ধারিত পদ সমূহ নিয়মিতভাবে যথাযথ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা।

(ঘ) দলের তহবিল গঠন ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ এবং সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। প্রতি বছর দলের আয়-ব্যয়ের অডিট করা হিসাব কমিশনে দাখিল করতে হবে।

(ঙ) দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে আন্তত পাঁচ বছরের দলীয় প্রাথমিক সদস্যপদ ও দলীয় কার্যক্রম সক্রিয় অংশ গ্রহণ থাকতে হবে।

(চ) কোন দল ক্রমাগতভাবে ৯০ কার্য দিবস সংসদ অধিবেশন বর্জন করলে দলের নিবন্ধন বাতিল হবে।

(৫) নির্বাচনী সন্ত্রাস রোধ করা ঃ

(ক) নির্বাচনে সর্বপ্রকার বল প্রয়োগ, অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন পরিপূর্ণ নিষিদ্ধ করা এবং বল প্রয়োগের ঘটনার কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে।

(খ) নির্দিষ্ট মেয়াদে ফৌজদারি দন্ডদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

(গ) কোন রাজনৈতিক দল কোন সন্ত্রাসী ও কালো টাকার মালিককে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে না।

(৬) নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা রোধ করা ঃ

নির্বাচনে ধর্মের সর্বপ্রকার অপব্যবহার, সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রচারণা শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। সম্প্রদায়িক প্রচারণা নিষিদ্ধ হবে। সংবিধান অনুযায়ী এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের সমান সুযাগ থাকবে। সংখ্যালঘুর উপর কোন অন্যায় অত্যাচার মেনে নেয়া হবে না।

(৭) সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান এর লক্ষ্যে সবাই সমান সুযাগ পাবে ঃ

(ক) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ছয় মাস পূর্ব থেকে কোন দল বা প্রার্থী কোন নির্বাচনী এলাকায় কোন আর্থিক বা প্রকল্প গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিতে না পারে।

(খ) নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে সকল প্রকার দেয়াল লিখন ও যত্রতত্র পোস্টার, লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদি লাগানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

(গ) নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ষ্ট্যাগার্ড ভোটিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) ব্যালটে 'না' বাচক ভোটের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যদি না বাচক ভোট প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের বেশি হয় তবে পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) একজন ব্যক্তি একাধিক আসনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

(চ) ভুয়া প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কেউ ভুয়া প্রার্থী প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে।

(৮) নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর ভূমিকা ঃ

(ক) নির্বাচনের নিরাপত্তা বিধান, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও নির্বাচনী আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী নির্বাচন কমিশনের অধীনে ন্যস্ত থাকবে এবং তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনে থাকবে।

(খ) নির্বাচন কালে সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর দায়িত্ব এবং ক্ষমতা স্পষ্ট উল্লেখ থাকবে এবং প্রয়োজনে তাদেরকে সে সময়ে কিছু বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

(৯) নির্বাচনী বিরোধ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তিকরণ ঃ

(ক) নির্বাচন-পূর্ব বিরোধ রিটানিং অফিসার/এসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিষ্পত্তি করবেন, যার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের আপিল করা যাবে। কমিশন ১৫ দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

(খ) সুপ্রীম কোর্ট-প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ গঠন করবে যাতে নির্বাচনোত্তর বিরোধ/মামলা নির্ধারিত ছয় মাসের মধ্যেই চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়।

৬.৮ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ঃ

গণতান্ত্রিক সরকারের সফলতা মূলত রাজনৈতিক দলের সফলতার উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক দল সরকার ও জনগণের মধ্যে মিলন সৃষ্টি করে গ্রহণযোগ্য কর্মসূচির মাধ্যমে। জনগণের সর্বভৌম ক্ষমতা রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। রাজনৈতিক দল ছাড়া গণতন্ত্রের বিকাশ অসম্ভব।

৬.৮.১ রাজনৈতিক দল ঃ

গণতান্ত্রিত রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দল হচ্ছে জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্ত রূপ। রাষ্ট্রে যারা একই ধরনের ভাবনা চিন্তা করে অভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং তা একই লক্ষ্যাভিসারী তারা মিলে দল গঠন করে। রাজনৈতিক দল হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শীর্ষস্থানীয় কর্তা ব্যক্তিবর্গের সাথে রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের যোগসূত্র স্থাপনকারী সেতুবন্ধন স্বরূপ। যেহেতু গণতন্ত্রে ব্যক্তির মতামতের মূল্য রয়েছে তাই ব্যক্তির মতামত প্রকাশের মাধ্যম হচ্ছে

দল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও তার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য রাজনৈতিক দল থাকতেই হবে। গণতন্ত্রের হৃদপিন্ড হচ্ছে রাজনৈতিক দল।

৬.৮.২ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দল ঃ

রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে এবং সচেতন হয়ে উঠে। নির্বাচনে রাজনৈতিক দল প্রার্থী মনোনীত করে। প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে দলের যোগ্যতম এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করে। ঐ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণা চালায় রাজনৈতিক দলের কর্মীবৃন্দ। ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়াকে ব্যবহার করে জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। দলের কর্মসূচী জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিনে দলীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা দলীয় প্রার্থীর পক্ষে তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করে। ভোটদান, ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশের সময় দলীয় কর্মীরা সচেতনভাবে উপস্থিত থেকে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা ও সততা নিশ্চিত করে। প্রার্থীর জয় মানেই রাজনৈতিক দলের জয়। প্রার্থীর ব্যর্থতা মানে রাজনৈতিক দলের ব্যর্থতা।

মূল্যবোধের কর্তৃত্বমূলক বন্টনই হল রাজনীতি। আর নির্বাচনে জয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল সে কর্তৃত্ব লাভ করে। নির্বাচন হল রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা লাভের একমাত্র বৈধ পথ।

৬.৮.৩ বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ঃ

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক। গণতন্ত্রের স্বার্থে এখানে সুষ্ঠু দলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠা অত্যন্ত জরুরী। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলো দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের চোখে রাজনৈতিক দলের অবদান অনেক। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে দেশের শাসনভার কাঁধে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজের অবস্থান তৈরী করেছে। জনগণের সকল আশা

আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন না হওয়ায় রাজনৈতিক দলগুলো সমালোচনার মুখে পড়েছে। যথার্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের জন্য এবং আগামী বিশ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হলে বাংলাদেশে দলীয় ব্যবস্থার উত্তম বিকাশ প্রয়োজন। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে এ অঞ্চলের মানুষের রয়েছে দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল হল- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, জাতীয় পার্টি, জামাত-ই-ইসলাম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ওয়ার্কাস পার্টি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। অনেক রাজনৈতিক দল এখানে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ রাজনৈতিক দল নাম সর্বস্ব এবং গণসমর্থনহীন। এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রত্যেক দলেরই রয়েছে স্বতন্ত্র আদর্শ, স্বতন্ত্র অঙ্গীকার এবং স্বতন্ত্র কর্মসূচী। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতর ভাঙ্গন প্রবণতা বেশি। এছাড়া আন্তদলীয় কোন্দল, অবিশ্বাস এবং অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করা যায়। এখানে জোটবদ্ধতা লক্ষ্যনীয়, যেমন ১৪ দলীয় জোট, চারদলীয় জোট ইত্যাদি। এ জোটগুলো সর্বদা একে অন্যের বিপরীতে অবস্থান করে। বড় কয়েকটি দল ছাড়া অন্য দলগুলোর সাংগঠনিক ভিত্তি গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত নয়। দলের অভ্যন্তরে গনতন্ত্রের চর্চা দেখা যায় না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

সারণি: ৬.২

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল সমূহ

নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহ[১৯]			
নিবন্ধন নম্বর	রাজনৈতিক দলের নাম	নিবন্ধন তারিখ	প্রতীকের নাম
০০১	লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি - এলডিপি	২০/১০/২০০৮	ছাতা
০০২	জাতীয় পার্টি - জেপি	২০/১০/২০০৮	বাইসাইকেল
০০৩	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)	০৩/১১/২০০৮	চাকা

০০৪	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	০৩/১১/২০০৮	গামছা
০০৫	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	০৩/১১/২০০৮	কাস্তে
০০৬	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (স্থগিত)		
০০৭	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল - বি.এন.পি	০৩/১১/২০০৮	ধানের শীষ
০০৮	গণতন্ত্রী পার্টি	০৩/১১/২০০৮	কবুতর
০০৯	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	০৩/১১/২০০৮	কুঁড়েঘর
০১০	বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	০৩/১১/২০০৮	হাতুড়ী
০১১	বিকল্পধারা বাংলাদেশ	০৩/১১/২০০৮	কুলা
০১২	জাতীয় পার্টি	০৩/১১/২০০৮	লাঙ্গল
০১৩	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	০৩/১১/২০০৮	মশাল
০১৪	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	০৪/১১/২০০৮	দাঁড়িপাল্লা
০১৫	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	০৯/১১/২০০৮	তারা
০১৬	জাকের পার্টি	০৯/১১/২০০৮	গোলাপ ফুল
০১৭	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	০৯/১১/২০০৮	মই
০১৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি	০৯/১১/২০০৮	গরুরগাড়ী
০১৯	বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন	০৯/১১/২০০৮	ফুলের মালা
০২০	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	১৩/১১/২০০৮	বটগাছ
০২১	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	১৩/১১/২০০৮	হারিকেন
০২২	ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)	১৩/১১/২০০৮	আম
০২৩	জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	১৩/১১/২০০৮	খেজুরগাছ
০২৪	গণফোরাম	১৩/১১/২০০৮	উদীয়মান সূর্য
০২৫	গণফ্রন্ট	১৩/১১/২০০৮	মাছ
০২৬			
০২৭	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ	১৩/১১/২০০৮	গাভী
০২৮	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	১৬/১১/২০০৮	কাঁঠাল
০২৯			
০৩০	ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ	১৬/১১/২০০৮	চেয়ার
০৩১	বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	১৭/১১/২০০৮	হাতঘড়ি
০৩২	ইসলামী ঐক্যজোট	১৭/১১/২০০৮	মিনার
০৩৩	বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস	২০/১১/২০০৮	রিক্সা
০৩৪	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	২০/১১/২০০৮	হাতপাখা
০৩৫	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২০/১১/২০০৮	মোমবাতি
০৩৬	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি-জাগপা	২০/১১/২০০৮	হুক্কা
০৩৭	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	২০/১১/২০০৮	কোদাল
০৩৮	খেলাফত মজলিস	২২/১১/২০০৮	দেওয়াল ঘড়ি
০৩৯			
০৪০	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল	০২/০৬/২০১৩	হাত (পাঞ্জা)

০৪১	বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট (মুক্তিজোট)	০৮/১০/২০১৩	ছড়ি
০৪২	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ	১৮/১১/২০১৩	টেলিভিশন
০৪৩	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম	৩০/০১/২০১৯	সিংহ
০৪৪	বাংলাদেশ কংগ্রেস	০৯/০৫/২০১৯	ডাব
০৪৫	তৃণমূল বিএনপি	১৬/০২/২০২৩	সোনালী আঁশ
০৪৬	ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ	০৮/০৫/২০২৩	আপেল
০৪৭	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	০৮/০৫/২০২৩	মটরগাড়ি (কার)
০৪৮	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-বিএনএম	১০/০৮/২০২৩	নোঙ্গর
০৪৯	বাংলাদেশ সুপ্রীম পার্টি (বি.এস.পি)	১০/০৮/২০২৩	একতারা
০৫০	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)	২১/০৮/২০২৪	ঈগল
০৫১	গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি)	০২/০৯/২০২৪	ট্রাক
০৫২	নাগরিক ঐক্য	০২/০৯/২০২৪	কেটলি
০৫৩	গণসংহতি আন্দোলন	১৭/০৯/২০২৪	মাথাল
০৫৪	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি	০২/০২/২০২৫	ফুলকপি
০৫৫	বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি (বিএমজেপি)	০৯/০৪/২০২৫	রকেট
০৫৬	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	২৫/০৯/২০২৫	আনারস
০৫৭	বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (বিআরপি)	২৩/১০/২০২৫	হাতি
০৫৮	জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি	১৭/১১/২০২৫	শাপলা কলি
০৫৯	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	১৭/১১/২০২৫	কাচিঁ
০৬০	জনতার দল	১১/১২/২০২৫	কলম

উৎসঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইট (**১১-১২-২০২৫**খ্রি. পর্যন্ত),

https://www.ecs.gov.bd/page/political-parties

৬.৮.৪ বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ঃ

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা হলো নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার। সকল দল এ বিষয়ে সক্রিয়। আশির দশকের শুরু থেকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের ফলে সামরিকতন্ত্রের পতন ঘটে নব্বইয়ে। নব্বইয়ের মুক্ত নির্বাচন আন্দোলন এর সঙ্গে মানুষ বেরিয়ে পড়েছিল গণতন্ত্রের অভিযাত্রায়। রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি ছিল রাজনীতিতে গুনগত পরিবর্তন আনা। নব্বইকে যদি আমরা মনে করি গণতন্ত্রের ফিরে আসা, পরবর্তী সময়টা গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার সময় হতে পারে। দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, দলীয়করণ ইত্যাদির ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। এ অবস্থা থেকে রাষ্ট্র ও সমাজকে মুক্ত করতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ও নির্বাচনকে কালো টাকা, সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের রূপরেখায় ২০০৫ সাল থেকে আন্দোলন গড়ে উঠে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহকে গণতান্ত্রিক বিধিবিধানের ভিত্তিতে পরিচালনা করা, দলের কর্মকর্তাদের নিয়মিত নির্বাচন ও দলের আর্থিক বিবৃতি পেশের কথাও আন্দোলনের ঐ সংস্কার প্রস্তাবে ছিল। নির্বাচনী সংস্কারের পাশাপাশি রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থবহ পরিবর্তন আনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল।

রাজনৈতিক দলগুলো একটি কথা সর্বদাই বলে আসছিল যে, রাজনীতি কিংবা নির্বাচনী যে কোন সংস্কারের কথাই বলা হোক না কেন, তা জনগণের উপর নির্ভর করে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই সেটা করতে হবে অন্য কোনভাবে নয়।

সকল দলেই নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের চিন্তা ঃ

নির্বাচনী আইন সংস্কারে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ একবার প্রথম আলোকে বলেছিলেন নির্বাচন কমিশন নিয়ে অনেক ক্রুটি

বিচ্যুতি ছিল একথা সত্য। এসব ত্রুটি দূর করতে সংস্কার করতেই হবে। বিএনপির তৎকালীন যুগ্ম মহাসচিব সংস্কারের গুরুত্ব স্বীকার করেন।[১] আওয়ামীলীগের তৎকালীন সভাপতিমন্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমদ নির্বাচন কমিশনের সংস্কার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য এ ধরনের সংস্কার প্রয়োজন আছে।[২]

নির্বাচনী আইন সংস্কারের বিষয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মনোভাব ঃ

যখন থেকেই সংস্কার প্রসঙ্গটি এসেছে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কারকে স্বাগত জানিয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর সংস্কার প্রস্তাব ঃ

২০২৪ সালের ১৩ জুলাই গুলশানে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ৩১ দফা ঘোষণা দেন। সংস্কারের লক্ষে বিএনপি ৩১ দফা রূপরেখা সংস্কার প্রসঙ্গে দলের আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ।

দলটির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা প্রায়ই তাদের আলোচনায় এই ৩১ দফার কথা বলেন। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়, সংবিধান ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার এবং অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে ৩১ দফা রূপরেখা ঘোষণা দিয়েছে তারা। প্রথম ৮টি দফায় নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রসঙ্গ রয়েছে। প্রথম ৮টি দফা এখানে উল্লেখ করা হলো[২০]-

১. প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতির বিপরীতে সব মত ও পথের সমন্বয়ে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, বৈষম্যহীন ও সম্প্রীতিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ জন্য অব্যাহত আলোচনা, মতবিনিময় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎমুখী এক নতুন ধারার সামাজিক চুক্তিতে পৌঁছাতে হবে।

২. বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে স্থায়ী সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি 'নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে।

৩. সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার নির্বাহী ক্ষমতায় ভারসাম্য আনা হবে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের সুসমন্বয় করা হবে।

৪. পরপর দুই টার্মের অতিরিক্ত কেউ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

৫. বিদ্যমান সংসদীয় ব্যবস্থার পাশাপাশি বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট নাগরিক, প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, পেশাজীবী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সংসদে 'উচ্চকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা' প্রবর্তন করা হবে।

৬. আস্থাভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এমন সব বিষয় ব্যতীত অন্যসব বিষয়ে সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে (দেখা হবে) বিবেচনা করা হবে।

৭. রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত এবং বিশিষ্টজনের অভিমতের ভিত্তিতে স্বাধীন, দক্ষ, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য ও দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর নির্বাচন কমিশন গঠন করার লক্ষ্যে বর্তমান 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২' সংশোধন করা হবে। ইভিএম নয়, সব কেন্দ্রে পেপার-ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান নিশ্চিত করা হবে। রাজনৈতিক দল নিবন্ধন আইন সংস্কার করা হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার বাতিল করা হবে।

৮. সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলীয়করণের ঊর্ধ্বে উঠে সকল রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এসব প্রতিষ্ঠান আইনি সংস্কারের মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হবে। শুনানির মাধ্যমে সংসদীয় কমিটির ভেটিং সাপেক্ষে এসব প্রতিষ্ঠানের সাংবিধানিক ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেওয়া হবে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-এর সংস্কার প্রস্তাব ঃ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৯ অক্টোবর, ২০২৫ নির্বাচন ব্যবস্থা বিষয়ক তাদের সংস্কার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে।

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রস্তাবনা ঃ[২১]

১. জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা (Proportional Representation-PR) চালু করতে হবে।

২. সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে স্থায়ীভাবে সন্নিবেশিত করতে হবে।

৩. নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রত্যাখ্যাত ইভিএম ভোটিং ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

৪. কোনো সরকারি চাকরিজীবী তাদের চাকরি ছাড়ার কমপক্ষে ৩ বছরের মধ্যে কোনো ধরনের নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৫. স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ২০০৮ সালে প্রবর্তিত রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথা বাতিল করতে হবে।

৭. নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা ও প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে সার্চ কমিটি গঠিত হবে।

৮. জাতীয় সংসদ নির্বাচন একাধিক দিনে অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. NID-ব্যবস্থাপনা নির্বাচন কমিশনের অধীনে আনতে হবে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ হতে আসা নানাবিধ সংস্কার প্রস্তাব ঃ[২২]

তত্ত্বাবধায়ক বাবস্থা সৃষ্টির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সংস্কার প্রসঙ্গটি ব্যাপকতা পায়। ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হতে নানাবিধ সংস্কার প্রস্তাব আসে।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার ঃ

১) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্তবর্তীকালীন শাসনামলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করায় নানাবিধ সংকট ও সমস্যা সৃষ্টির সমূহ সম্ভাবনা দৃশ্যমান হয়ে উঠে। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির দুটি ক্ষেত্র ছাড়া সমুদয় কাজ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে করে থাকেন। কিন্তু সংবিধানের ওই বিধানে রাষ্ট্রপতিকে এমন কিছু ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে যা সংসদীয় পদ্ধতির মূল চেতনার পরিপন্থী। এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় দ্বৈত কাঠামো তৈরি হয়েছে যা অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্খিত সংঘাতের জন্ম দিতে পারে। রাষ্ট্রপতির হাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ন্যস্ত থাকা এর অন্যতম। অন্যদিকে নির্দলীয় সরকারের রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকার বিধানটি সংবিধানের পরিপন্থী এবং ঐ সময় কালে রাষ্ট্রপতিকে একক ক্ষমতার অধিকারী করে।

২) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান এবং তিনি না হলে সুপ্রিমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত অন্যান্য প্রধান বিচারপতি অথবা আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্যে থেকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের বিধান বিচার বিভাগের রাজনীতিকরণ ও দলীয়করণের প্রবণতা সৃষ্টি করেছে। শুধু বিচারকদের চাকরির সময়সীমা ৬৫ থেকে ৬৭ তে আকস্মিকভাবে উন্নীত করা তারই সাক্ষাত বহন করেছে। এ ব্যবস্থাকে আরো উপযুক্ত, দক্ষ ও কার্যকর করার জন্য প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রটি কেবল বিচার বিভাগের পরিমন্ডল থেকে বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

৩) সংবিধানের বিধান অনুযায়ী নির্দলীয় সরকারের দায়িত্ব অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করা ও অন্তবর্তীকালীন সরকার হিসেবে সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদন করা এবং প্রয়োজন ব্যতীত কোনভাবেই কোন নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা। এ ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

৪) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সংস্কারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টারা কোন রাজনৈতিক দল অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত কোনো সংগঠনের সদস্য হবেন না।

সর্বোপরি প্রধান উপদেষ্টাকে সব রাজনৈতিক দলের আস্থাভাজন হতে হবে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাংবিধানিক ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করতে সংবিধানের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানকে জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জনগণের সে দাবি অনুযায়ী-

ক) রাষ্ট্রপতি সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে আস্থাভাজন ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যদের নিয়োগদান করবেন।

খ) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে বিবেচনায় রেখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধানকালীন সময়েও রাষ্ট্রপতি সব বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।

গ) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার মেয়াদকালীন সময় প্রতিরক্ষা বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যস্ত হবে এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত হবে।

ঘ) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যপরিধি সংবিধান অনুসারে কেবল সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা প্রদানের মধ্যে সীমিত থাকবে।

অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কার ঃ

একটি স্বাধীন ও কার্যকর নির্বাচন কমিশনই অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে। নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশন নির্বাহী বিভাগের কাছে অসহায় থাকে। এ অবস্থায় নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে-

১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝতার ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে।

২) কমিশনারের সাধারণ নিয়মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়েই কাজ করবে। তবে একাধিক মতামতের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত কার্যকর করবে।

৩) নির্বাচন কমিশন একটি স্থায়ী সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বিধায় তার মর্যাদা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণসহ সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশে নির্বাচন কমিশন কাজ করবে।

৪) নির্বাচন কমিশনের একটি স্বাধীন সচিবালয় থাকবে। কমিশন তার কর্মচারী-কর্মকর্তা নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করবে। নির্বাচনের সময় নির্বাচন কমিশনকে তার চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সংখ্যক জনবল সরকার সরবরাহ করবে।

৫) নির্বাচন কমিশন আর্থিকভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীন হবে এবং এ জন্য বাজেটসমূহ তহবিলের দায়মুক্ত ব্যয়ের বিধান অনুযায়ী সরাসরি বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

৬) নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ও নির্বাচনে নিরাপত্তার জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীন থাকবে এবং এ ব্যাপারে সরকার তার অনুরোধ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য থাকবে।

৭) নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত বাহিনী নির্বাচনের আগে ও পরে একটি নির্দিষ্ট সময়কালে নির্বাচন কমিশনের অধীন থাকবে এবং ঐ সময় কালে তাদের দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধ ও কর্তব্য অবহেলার জন্য নির্বাচন কমিশন তাৎক্ষনিকভাবে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে এবং সরকার তা বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে।

৮) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা ও নির্বাচন বিধি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে।

৯) নির্বাচনী আইন ও বিধি লঙ্ঘনের জন্য নির্বাচন কমিশন নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা ও বাতিল করতে পারবে এবং ঐ আইন ও বিধি লঙ্ঘনকারীদের আটক করার জন্য আদেশ ও শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারবে। এ জন্য ঐ সময়কালে নির্বাচন কমিশনকে বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

১০) ক) ভোটার জরিপ প্রণয়নের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বচ্ছতা রাখতে হলে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি করার ব্যবস্থাসহ ভোটার তালিকা প্রতিনিয়ত নবায়ন করার স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে।

খ) পার্বত্য শান্তি চুক্তি অনুযায়ী পাবর্ত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

গ) প্রবাসীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

১১) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের সময় নির্বাচনী এলাকার ভিত্তিতে সর্বদলীয় পর্যবেক্ষণ দল গঠন করবে। জাতীয় ক্ষেত্রে নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের মূল্যায়ন নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বে করে তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং এই পর্যবেক্ষকদের তালিকা নির্বাচন তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সরবরাহ করতে হবে। এসব পর্যবেক্ষক কোনক্রমেই ভোট কক্ষ বা বুথে যাবে না।

১২) আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দলের নাম ন্যূনতমপক্ষে ভোট গ্রহণের একমাস আগে প্রকাশ করতে হবে এবং তাদের কার্যপরিধি ও নির্দিষ্ট থাকবে।

১৩) ভোট কেন্দ্রে সবার উপস্থিতিতে নির্বাচনী ভোট গণনা ও ফলাফলের স্বাক্ষরিত কপি প্রার্থী বা তার মনোনীত প্রার্থী এবং নির্ধারিত পর্যবেক্ষকদের প্রদান করবে। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনের ফলাফলের কনসলিডেটেড বিবরণী নির্বাচন কমিশনকে প্রেরণ করবেন এবং কেবল নির্বাচন কমিশনই নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করবে।

১৪) নির্বাচনী ফলাফল বিরোধের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল কোন মামলা দায়ের করা হলে দু'মাসের মধ্যে তার নিস্পত্তি করা এবং সে সংক্রান্ত কোন আপিল সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের বেঞ্চ কর্তৃক তিন মাসের মধ্যে নিস্পত্তি করতে হবে। এ বিষয়েও নির্বাচন কমিশন নিজে পক্ষভুক্ত হয়ে মামলা নিস্পত্তির ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।

নির্বাচনী আইন ও বিধির সংস্কার ঃ

১) নির্বাচনে টাকার খেলা বন্ধ করাঃ

ক) প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষে অন্য যারা যেভাবে ব্যয় করেন তা প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে এবং তা কোনো ক্রমে নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা লঙ্ঘন করবে না। প্রতি নির্বাচনী এলাকায় একজন নির্ধারিত কর্মকর্তা এই ব্যয় মনিটর করবেন এবং নির্বাচন

কমিশনকে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করবেন। এই রিপোর্টের সঙ্গে প্রার্থীর দেয়া নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণ মিলিয়ে দেখা হবে।

খ) প্রার্থীর নির্বাচন আয়-ব্যয়ের বিবরণ সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করতে উন্মুক্ত দলিল হিসেবে রাখতে হবে এবং প্রচার মাধ্যমকে তা সরবরাহ করতে হবে। যে কোনো ভোটার এ ব্যাপারে তাদের আপত্তি জানাতে পারবেন।

গ) নির্বাচনী কাজে আয়-ব্যয়ের হিসাব এক মাসের মধ্যে জমা দিতে হবে এবং তা করতে না পারলে ঐ নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করতে হবে।

ঘ) খেলাপী ঋণ পুনঃ তফসিলীকরণ করা না হলে ঋণ খেলাপী কোনো প্রার্থী নির্বাচনে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ঋণ খেলাপির জামিনদারও অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

২) প্রার্থীদের সম্পদ ও পরিচয় প্রকাশ ঃ

ক) প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের আগে তার নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পদের বিবরণ কোনো রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তার স্বার্থ জড়িত আছে কিনা সে সম্পর্কে বিবরণ দিতে হবে।

খ) হাইকোর্ট যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সে অনুযায়ী প্রার্থীদের শিক্ষাগত, অন্যান্য যোগ্যতা ও কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কিনা, সে তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য প্রার্থীর মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

গ) নির্বাচন কমিশন এসব তথ্য জনগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা করবে যাতে ভোটাররা প্রার্থীর যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্পর্কে অবগত থাকবেন।

৩) প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ঃ

ক) নিজে অথবা পরিবারের কেউ ঋণ খেলাপি হলে, সে কালো টাকার মালিক বলে বিবেচিত হবে।

খ) সরকারি চাকুরি বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে কোনো সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনী প্রার্থী হতে পারবেন না।

গ) স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতাকারী যুদ্ধাপরাধী হলে কেউ নির্বাচনের প্রার্থী হতে পারবে না। স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রেও এই বিধি প্রযোজ্য হবে।

ঘ) দলের মনোনয়ন প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তৃণমূল থেকে মনোনয়ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা, দলের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুসরণ এবং মনোনয়ন প্রাপ্তির জন্য অর্থ দ্বারা প্রভাবিত করার ঘটনা কার্যকরভাবে রোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) নির্বাচনকে সন্ত্রাস, পেশিশক্তির প্রভাব ও দুর্বৃত্তমুক্ত করতে ঃ

ক) নির্বাচনে সর্বপ্রকার বল প্রয়োগ, অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন পরিপূর্ণ নিষিদ্ধ করা এবং বল প্রয়োগের ঘটনার কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে।

খ) নির্দিষ্ট মেয়াদে ফৌজদারি দন্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

গ) কোনো রাজনৈতিক দল কোনো সন্ত্রাসী ও কোনো কালো টাকার মালিককে মনোনয়ন প্রদান করবে না।

৫) নির্বাচনে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার ব্যবহার ঃ

নির্বাচনে ধর্মের সর্বপ্রকার অপব্যবহার, সাম্প্রদায়িক প্রচার প্রচারণা ও ভোট চাওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। সাম্প্রদায়িক প্রচারণা নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬) নির্বাচনে সবার সমান সুযোগ দান ঃ

ক) পোস্টার, লিফলেট, বৈদ্যুতিক বিজ্ঞাপন ব্যবহার, মাইক, নির্বাচনী ব্যানার, দেয়াল লিখন, গেট নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে যে সব নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আছে তা ব্যতিক্রমহীনভাবে পালন করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তা এ বিষয়ে নিশ্চিত করবেন এবং এ ক্ষেত্র কোনো প্রকার আইন ও বিধি ভঙ্গ করা হলে তাৎক্ষনিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করবেন।

খ) নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দিন থেকে সব দলের কেন্দ্রীয় সমাবেশ, মহাসমাবেশ, র‍্যালি, জনসভা ও ব্যয় কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

গ) নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রচলিত আইন অনুযায়ী নির্বাচিত অফিস ব্যতিরেকে কোনো নির্বাচনী ক্লাব, ক্যাম্প, নির্বাচনী প্রচার কেন্দ্র হিসেবে কোনো কাঠামো তৈরি করা যাবে না।

ঘ) প্রতিটি বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং লঙ্ঘণকারীদের প্রার্থীতা বাতিল করতে হবে।

৭) নির্বাচন পরিচালনা দক্ষতা বিধান ঃ

ক) নির্বাচন পরিচালনার জন্য নিয়োগকৃত প্রিসাইডিং অফিসার, অ্যাসিন্ট্যাস্ট প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারদের তালিকা নির্বাচনের ১৫ দিন আগেই প্রার্থীদের সরবরাহ করতে হবে, যাতে এ বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপিত হলে তা নির্বাচনের আগেই নিষ্পত্তি করা যায়।

খ) নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের তালিকা ও একইভাবে ১৫ দিন আগে প্রকাশ করতে হবে। জনগণকে অবহিত করতে উভয় বিষয়েই স্থানীয়ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর ভূমিকা ঃ

ক) নির্বাচনের নিরাপত্তা বিধান, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও নির্বাচনী আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে নির্বাচন কমিশনে ন্যস্ত করতে হবে এবং তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনের থাকবে।

খ) আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর সংজ্ঞা পরিবর্তন ও তাদের বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করে এর আগেকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৭২ সালের পিত্ত নং- ১৫৫ তে বিধি ৮৭ এবং ৮৯ এর মাধ্যমে পরিবর্তন সাধন করেছে, তা বাতিল করতে হবে এবং ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধির আদেশ ও ১৯৯১ সালের নির্বাচনী আইন অনুযায়ী নির্বাচনকালে সশস্ত্র বাহিনী এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর দায়িত্ব ক্ষমতার যে এখতিয়ার ছিল, তা পূর্ণবহাল করতে হবে।

৯) রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করা ঃ

ক) নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে গণতান্ত্রিক বিধি বিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে হবে এবং পরিচালনা দলের কর্মকর্তাদের নিয়মিত নির্বাচন, দলের আর্থিক বিবৃতি নির্বাচন কমিশনকে প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

খ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের ব্যাপারে রাজনৈতিক কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

১০) রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ ঃ

ক) নির্বাচন আচরণ বিধি যা রয়েছে, তা কঠোর ভাবে প্রয়োগ এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে তার জন্য সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য কেন্দ্র ও জেলা পর্যায়ে সর্বদলীয় পরামর্শ কমিটি গঠন করতে হবে।

১১) সংরক্ষিত মহিলা আসনে আসন বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২) নির্বাচন করার পূর্বশর্ত 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড'ঃ

নির্বাচনে 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' বা সমতল ক্ষেত্র নিশ্চিত করতে হবে। তাই যথার্থ নির্বাচনের জন্য সংবিধান সংশোধন করে অনুচ্ছেদ ১২৩(৩)(ক)-এ অধিকতর সংশোধনী আনা প্রয়োজন।

৬.৯ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা ঃ

৬.৯.১ সিভিল সোসাইটিঃ

সম্প্রতি সিভিল সোসাইটি ব্যাপারটি বিশ্বব্যাপী মতবিনিময়কারী ব্যক্তিবর্গের ভিতরে একটা পছন্দনীয় কথা হয়ে উঠেছে। সিভিল সোসাইটির উল্লেখ না করে আজকের দিনে রাজনীতি বা সরকারি নীতিমালা নিয়ে কথা বলা অনেক কঠিন। পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন (১৯৮৯) ও তৎপরবর্তী জাতি গঠন ও গঠনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সিভিল সোসাইটির ভূমিকা বিশ্বায়নের এই যুগে সামাজিক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। সিভিল সোসাইটি প্রত্যয়টি নব্বই এর দশকের শুরু থেকেই বাংলাদেশের তাত্ত্বিক ও গবেষকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব লাভ করেছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দাতাগোষ্ঠীর সাহায্যের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক মহল থেকে এর বিকাশ বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

সিভিল সোসাইটি শব্দটি অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হলেও এর অনেক বাংলা প্রতিশব্দ রয়েছে। কেউ কেউ বাংলা করেছেন সুশীল সমাজ, কেউ কেউ নাগরিক সমাজ আবার কেউ কেউ সিভিল সমাজ। সিভিল সমাজকে নাগরিক সমাজ নামেও আখ্যা দিয়েছেন অনেকে। ব্যবহৃত হয় সিভিল সোসাইটি শব্দটিও। বস্তুত এ তিনটি শব্দের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।[২৩] বর্তমানে সিভিল সোসাইটি শব্দটিও যথেষ্ট পরিচিত। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাহক হিসেবে সুসংগঠিত সিভিল সোসাইটির প্রয়োজন সর্বমহলে স্বীকৃত হয়েছে।

মধ্যযুগ উত্তর ও আধুনিককালে সিভিল সোসাইটির ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন মত পার্থক্য দেখা গেলেও এই ধারণাটির বিকাশ সপ্তদশ শতকে জন লক ও হ্যারিংটনের আলোচনার মাধ্যমে।[২৪] পরবর্তীতে ফারগুসন ও স্মিথ, রুশো, হেগেল এবং ম্যাকিয়াভেলির আলোচনার মাধ্যমে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ডিসকোর্সে পরিণত হয়। অনেক তাত্ত্বিকই একে ‘ছাতা সদৃশ্য’ ধারণার সাথে তুলনা করেছেন যা রাষ্ট্রের বাইরে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। জন লক রাষ্ট্রকে সিভিল সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের একীভূত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছেন। পরবর্তীতে রুশোও একই ধারণা পোষণ করেছেন।[২৫] হেগেল বুর্জোয়াদেরকেই সিভিল সমাজ হিসেবে দেখেছেন। কার্ল মার্কস ও গ্রামসি সিভিল সমাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। মার্কস এর মতে সিভিল সমাজ হচ্ছে মুলত বুর্জোয়া সমাজ এবং যেখানে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিপরীতে ব্যক্তি স্বার্থই প্রাধান্য পায়। গ্রামসির মতে সিভিল সমাজ হলো একক ধরনের সংগঠন ও টেকনিক্যাল মাধ্যম যার উপর ভিত্তি করে শাসক সমাজ সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তাদের আদর্শিক মতাদেশে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়। ফরাসি চিন্তাবিদ টকিয়াভিলে সিভিল সমাজের প্রাধান্য স্বীকার করে বলেন যে, “রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে সিভিল সমাজই ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারে এবং সিভিল সমাজ তার অধিকার রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারে।”[২৬] মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায় সামরিক শাসক বা সামরিক সমাজের বিপরীতে রাষ্ট্রে, সমাজে নিরস্ত্র মানুষের কর্তৃত্বই মূলত সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা।[২৭] ২৪ জুলাই ১৯৯৭ এনজিও আয়োজিত

সম্মেলনে সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন- A civil society represnts the ordinary members of a society.[২৮] সকল বিতর্ক পিছনে ফেলে একুশ শতকে সিভিল সোসাইটি হয়ে উঠেছে গণতন্ত্র রক্ষা ও সরকারের উপর কার্যকর নজরদারির একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে সিভিল সোসাইটি ধারণার সাথে পুঁজিবাদী সমাজের বাজার অর্থনীতির ধারণা জড়িত। তাই বলা যেতে পারে পরিবার, রাষ্ট্র ও বাজার এর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় জনস্বার্থে যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি কর্তৃক। তারাই সিভিল সমাজ।

৬.৯.২ বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটি ঃ

গবেষকগণের মতে সিভিল সোসাইটি হচ্ছে বেসরকারি অলাভজনক অরাজনৈতিক সংগঠন, যা জনগণের স্বার্থের পক্ষে কাজ করে। তাই প্রেস, মিডিয়া, শ্রমিক সংগঠন, ধর্মীয় ও পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ সবই সিভিল সোসাইটির অন্তর্ভূক্ত।[২৯]

অন্যদিকে সিভিল সোসাইটি হচ্ছে রাষ্ট্র, বাজার ও রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে জনগণের বা কোন গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ কোন কার্যক্রম। কেননা উপরোক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানই একক বা সংঘবদ্ধভাবে সকল ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই রাষ্ট্র, বাজার ও রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার একদিকে অবস্থান করে আর অন্যদিকে থাকে সাধারণ জনগণ। অতএব "The Society of the common masses is civil society" বাংলাদেশ কর্পোরেট বাজার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে সিভিল সোসাইটির বাইরে রাখা যায়। কিন্তু এনজিও সিভিল সোসাইটির অংশ।

অতএব, বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সিভিল সোসাইটি হল যে সকল প্রতিষ্ঠান যা একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে। যেখানে ব্যক্তিরা একত্রিত

হয়ে ভলান্টরি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে ও গনসচেতনতা, জনমত তৈরি এবং সরকারের দমনমূলক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরিতে সচেষ্ট থাকে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি ও গণআন্দোলন তৈরির প্লাটফর্ম হিসেবে সিভিল সোসাইটি কাজ করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাকিস্তান আমলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সিভিল সোসাইটি জড়িত ছিল। বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলন বা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ইত্যাদি যদিও প্রধানত রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে পরিগণিত তথাপি এর সাথে সিভিল সোসাইটির ভূমিকাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই।

(১৯৮১-১৯৯০) সময়কালটি সিভিল সোসাইটির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখন সামরিকতন্ত্র বিরোধী রাজনৈতিক মতাদর্শ ও গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সিভিল সমাজ অগ্রনী ভূমিকা রাখে এবং ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক সক্ষমতা অর্জন ও বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যুতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে এনজিওদের বিকাশ ঘটেছে। ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন মনিটরিং করার জন্য গঠিত হয়েছিল বাঁচতে শেখা, ডেমোক্রেসি ওয়াচ, ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং এজেন্সী প্রভৃতি।[৩০] আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বৈদেশিক সাহায্যদাতা প্রতিষ্ঠান সমূহ তৃতীয় বিশ্বের এনজিওদের সরাসরি বা সরকারের মাধ্যমে ফান্ড সরবরাহ শুরু করে, যা সিভিল সোসাইটির ক্ষমতায়ন হিসেবে চিহ্নিত হয়। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, (১৯৮৮-৮৯) সালে উন্নয়নের নামে বাংলাদেশে আসা বিদেশী অর্থের ৬ ভাগ পেত এনজিওরা, পরবর্তিতে দ্রুত সে হার ১৭ ভাগে উন্নীত হয়। [৩১]

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ও আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের মতো দেশবরেণ্য সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি এখন তৃতীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার

হলো সিভিল সোসাইটির সরকার।[৩২] তৃণমূল পর্যায়ে রাজনৈতিক সচেতনতা, অধিকমাত্রায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য ফেমা (FEMA) অধিকার (ODHIKAR) এর মত বিভিন্ন নির্বাচনী মনিটরিং সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে টিআইবি (TIB) সিপিডি (CPD) এর মত প্রতিষ্ঠানগুলো জনমত গঠন ও সরকারের উপর নজরদারির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার প্রসারের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সিভিল সোসাইটির শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

৬.৯.৩ বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া জোরদারে সিভিল সোসাইটি ঃ

গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রয়োজন সামাজিক সংগঠনগুলোর সক্রিয়তা, রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতর সমঝোতা। গণতন্ত্রের মান উন্নয়নের জন্য চাই নাগরিক সমাজের বিকাশ। গনতন্ত্রের অন্যতম বিষয় নির্বাচনকে করতে হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিক সমাজের ভূমিকাকে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা হচ্ছে। ল্যারী ডায়মন্ড (১৯৯১) গণতন্ত্রকে পুষ্ট করার ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের অন্তত ছয় ধরনের অবদানের কথা বলেছেন।[৩৩]

১. রাষ্ট্রের বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক শক্তির দরকার পড়ে তা নাগরিক সমাজের মধ্যে রয়েছে।

২. নাগরিক সমাজের ভেতরে যে বৈচিত্র রয়েছে তার কারণেই রাষ্ট্র মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর হাতে বন্দি হয়ে থাকতে পারে না।

৩. জনগণের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে যে সাংগঠনিক তৎপরতা পরিচালনা করা হয় নাগরিক সমাজ তাকে আরো গতিশীল করতে সম্পূরক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

৪. রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করতে হলে তার প্রতি নাগরিক দায় বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। আর নাগরিক সমাজ ঠিক সে কাজেই সহায়ক হতে পারে। একথা ঠিক নাগরিক সমাজ

রাষ্ট্রের কাছে প্রাপ্য নাগরিকদের দাবি দাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে যেমন সাহায্য করে তেমনি নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে তৎপর হতেও নাগরিকদের সক্ষম করে তুলতেও তার ভূমিকা হতে পারে ইতিবাচক।

৫. নয়া রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে নাগরিক সমাজের নেতৃত্বের দিকেই হাত বাড়াতে হয়।

৬. যে কোন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে থাকে নাগরিক সমাজ বা সিভিল সোসাইটি।

৬.৯.৪ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে সিভিল সোসাইটি ঃ

বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কার ঃ একটি প্রাথমিক প্রস্তাব (সুজন কর্তৃক প্রস্তাবিত ৬ এপ্রিল ২০০৬)

১.১ ভোটার তালিকার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ ঃ

* ভোটার তালিকা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল হতে হবে।

* ভোটার তালিকা নিয়মিতভাবে সংশোধন বা আপ-ডেট করতে হবে এবং ক্রমাগত প্রচারাভিযান চালাতে হবে যাতে নতুন ভোটার ও ঠিকানা পরিবর্তনকারী ব্যক্তিগণ খুব সহজেই তালিকাভুক্ত হতে পারে।

* বছরব্যাপী ভোটার তালিকা সংশোধন ও বিয়োজনের জন্য পোস্ট অফিসকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

* ভোটারদের ছবি ও ভোটার নম্বর সম্বলিত পরিচয়পত্র দিতে হবে, যাতে ভোটের দিনে নির্বাচনী বুথ স্থাপন করতে না হয়।

১.২ নির্বাচনী ব্যয় সীমা হ্রাস এবং এতে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ ঃ

* নির্বাচনী সময়সীমা যাতে লঙ্ঘিত না হয় সেদিকে কঠোর নজরদারি করতে হবে।

* নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার ১৫ দিনের মধ্যে প্রার্থী তার নির্বাচনী ব্যয় নির্ধারিত ফরমে দাখিল করতে ব্যর্থ হলে আইনে বর্ণিত শাস্তি (২-৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড)

কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। হিসাব দাখিল করা না হলে গেজেট নির্বাচনী ফল প্রকাশ স্থগিত রাখা যেতে পারে।

* দাখিল করা এ সকল তথ্য নির্বাচন কমিশন ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে প্রচার করবে এবং যথাযথ নিরীক্ষার পর অসত্য তথ্য প্রদানকারীদের নির্বাচন বাতিল করবে।

* সমর্থকদের ব্যয় প্রার্থীর ব্যয় বলে বিবেচিত হবে।

১.৩ নির্বাচনী বিরোধ / মামলা দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তিকরণ ঃ

* নির্বাচন পূর্ব বিরোধ রিটার্নিং অফিসার / এসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিস্পত্তি করবেন, যার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে আপিল করা যাবে। কমিশন ১৫ দিনের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবে এবং কমিশনের সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত।

* সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে কমিশন কোন কেন্দ্রের বা কেন্দ্রসমূহের নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করতে পারবে।

* সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ গঠন করবে যাতে নির্বাচনোত্তর বিরোধ / মামলা নির্ধারিত ছয় মাসের মধ্যেই চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয়।

১.৪ ভোটারদের তথ্য ভিত্তিক ক্ষমতায়ন ঃ

* প্রত্যেক প্রার্থী মনোনয়ন পত্রের সাথে একটি এফিডেভিট দাখিল করবেন যাতে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, তার এবং তার নিকটাত্মীয়দের আয়-ব্যয়ের তালিকা, আয়ের উৎস, সম্পদের তালিকা এবং তিন বছরের আয়কর রিটার্ন সংযুক্ত থাকবে। এফিডেভিট দাখিল না করলে মনোনয়ন পত্র বাতিল হবে।

*এফিডেভিটে প্রার্থীর অতীত অপরাধের তালিকা এবং চার্জ গঠন করা হয়েছে এমন বিচারাধীন মামলার তালিকা সংযুক্ত করতে হবে। যে কেউ বিরোধী এফিডেভিট (Counter Affidavit) দাখিল করতে পারবেন।

* নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতি বছর তাদের এবং তাদের ঘনিষ্টজনদের আয়-ব্যয়ের হিসাব, সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য ও আয়কর রিটার্ন নির্বাচন কমিশনে জমা দিতে হবে।

* এফিডেভিট প্রদত্ত তথ্য এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয় ও সম্পদের হিসাব সম্পর্কিত তথ্য নির্বাচন কমিশন ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা করবে। প্রদত্ত তথ্য অসত্য প্রমাণিত হলে কমিশন তার প্রার্থীতা / নির্বাচন বাতিল করবে।

* আদালত / তদন্ত কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত দুর্নীতিগ্রস্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে হবে।

* ঋণখেলাপী ও সরকারি সেবার বিলখেলাপীদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করতে হবে।

২. গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি ঃ

২.১ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান ঃ

* নির্বাচন আচরণ বিধি সংশোধন করতে হবে যাতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখের ৬ মাস পূর্ব থেকে অথবা কোন কারণে সংসদ বিলুপ্ত হলে, বিলুপ্তির তারিখ থেকে কোন দল বা প্রার্থী কোন নির্বাচনী এলাকায় কোন আর্থিক বা প্রকল্প গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিতে না পারে এবং দল তাদের অর্জনেরও প্রচারণা চালাতে না পারে।

* নির্বাচনী বিধি লঙ্ঘনের এবং নির্বাচনের দিনে পেশী শক্তি ব্যবহারের শাস্তি কঠোর ও তাৎক্ষণিক হতে হবে।

* নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য স্ট্যাগার্ড ভোটিং (Staggered Voting) এর ব্যবস্থা করতে হবে।

* নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে সকল প্রকার দেয়াল লিখন ও যত্রতত্র পোস্টার, লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদি লাগানোর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে এবং তা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

* ব্যালটে "না" বাচক ভোটের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং যদি "না" বাচক ভোট প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশের বেশি হয় তাহলে পুনঃনির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

* কোন কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোট গড় জাতীয় ভোটের ২০ শতাংশের বেশি হলে অথবা কোন প্রার্থী প্রদত্ত ভোটের ১০ শতাংশের বেশি পেলে ঐ কেন্দ্রের ভোট আপনা আপনি বাতিল হওয়ার বিধান করতে হবে।

* বিজয়ী এবং পরাজিত প্রার্থীর ভোটের মার্জিন এক শতাংশের কম হলে পুনঃগণনার বিধান করতে হবে।

* ভুয়া প্রার্থীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কেউ ভুয়া প্রার্থী প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির বিধান করতে হবে।

* ভোট গ্রহণ সঠিক করার জন্য নির্ভরযোগ্য যান্ত্রিক পদ্ধতি ভবিষ্যতে চালু করতে হবে।

* কোন ব্যক্তি একাধিক আসনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

২.২ রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ঃ

* রাজনৈতিক দলসমূহের নিবন্ধন ও প্রতি দুই বছর পর নিবন্ধন নবায়ন আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং শুধু নিবন্ধিত দলই নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারবে।

* নিবন্ধনের শর্ত হবে দলীয় গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত পদসমূহ নিয়মিতভাবে যথাযথ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা।

* দলের তহবিল গঠন ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ এবং সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। প্রতি বছর দলের আয় ব্যয়ের অডিট করা হিসাব কমিশনে দাখিল করতে হবে। নির্বাচন পরবর্তী হিসাবও নির্দিষ্ট ছকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে দাখিল করতে হবে।

* দলীয় মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে দলের প্রাথমিক সদস্যদের মতামত নেয়ার পদ্ধতিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

* দলীয় মনোনয়নের ক্ষেত্রে অন্তত পাঁচ বছরের দলীয় প্রাথমিক সদস্যপদ ও দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

* অর্থের বিনিময়ে দলীয় মনোনয়ন প্রদান প্রমাণিত হলে দলের নিবন্ধন বাতিল হবে।

* কোন দল ক্রমাগতভাবে ৯০ কার্যদিবস সংসদ অধিবেশন বর্জন করলে দলের নিবন্ধন বাতিল হবে।

৩. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ঃ

৩.১ রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ

* সংসদ সদস্য ও নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন।

* তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে আগামী তিন টার্মের জন্য সীমিত করতে হবে।

* তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল কাজ হবে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা।

৩.২ নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালীকরণ ঃ

* প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারগণ রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে সত্যতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় তারা নিয়োগ পাবেন এবং সংসদ ভেঙ্গে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।

* নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন নিজস্ব সচিবালয় থাকবে।

* নির্বাচনী আইনসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে।

* নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব বাজেট থাকবে ও নির্বাচন কমিশনের ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের (Consolidated fund) নির্ধারিত ব্যয় হিসেবে গন্য হবে।

* নির্বাচন পদ্ধতির এবং নির্বাচন সামগ্রীর নিরাপত্তার জন্য স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়কে চাওয়া মাত্র কমিশনকে সহায়তা করতে হবে।

* নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনস্বার্থ জড়িত আছে এমন সব সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য সভায় গ্রহণ করতে হবে।

৩.৩ জাতীয় সংসদের প্রতিনিধিত্বশীলতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ ঃ

* সকল পেশা ও সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তিদের, প্রতিনিধিদের নিয়ে সংসদের উচ্চ কক্ষের বিধান করতে হবে।

* নারীদের জন্য অন্তত এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে এবং সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

* সংসদ সদস্যদের আইন প্রনয়ণের (৬৫ অনুচ্ছেদ) সাংবিধানিক দায়িত্বে নিবিষ্ট এবং স্থানীয় উন্নয়ন কাজে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে।

* নির্বাহী বিভাগের যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করতে হবে। বিরোধী দল থেকে সংসদীয় কমিটিগুলোর চেয়ারম্যান হবেন।

* কার্যপ্রণালী বিধিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

* সংবিধানের (৭০) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একজন সদস্য তার সদস্যপদ তখনই হারাবেন যদি তার প্রদত্ত ভোটের কারণে সরকারের পতন ঘটে।

৩.৪ শাসন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণঃ

* সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদের আলোকে ও সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক প্রশাসনের সকল স্তরে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে। এ সকল নির্বাচন একই সময়ে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদকালীন অনুষ্ঠিত হবে।

* ক্ষমতা ও দায়দায়িত্বের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে।

* প্রশাসনে কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমলাতন্ত্রের আমূল সংস্কার এবং গণমুখী ও দল নিরপেক্ষ করতে হবে।

* নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

* জাতীয় বাজেটের অন্তত এক তৃতীয়াংশ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি স্বাধীন অর্থ কমিশনের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে।

* স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিধান করতে হবে।

* ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রাম সরকার ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে।

উপর্যুক্ত সুপারিশগুলো একটি প্রাথমিক প্রস্তাবনা মাত্র, শেষ কথা নয়। এর মূল লক্ষ্য হলো সংস্কার বিষয়ে তুমুল বির্তকের সূচনা করা, যা থেকে একটি জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টি হবে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিতে সিপিডির ১২ দফা সুপারিশ ঃ

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) নির্বাচনে কালো টাকার দৌরাত্য কমাতে রাজনৈতিক দলগুলোকে আইনি বাধ্যবাধকতায় আনার দাবি জানিয়েছে। সংস্কারের ক্ষেত্রে তা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সিপিডি ইলেকশন প্লাস ইকনোমিক এজেন্ডা নামে একটি কর্মসূচী উপস্থাপন করেছে। এই কর্মসূচীতে ১২ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।[৩৪]

এই কর্মসূচির ১২ দফার মধ্যে রয়েছে অর্থ পাচার রোধ আইন প্রয়োগ, কালো টাকা সাদাকারীদের নাম প্রকাশের আইন, ঋণখেলাপীর সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণ, ঋণখেলাপীদের নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য হালনাগাদ করা, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের মাধ্যমে প্রার্থীদের তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ, তথ্য জানার অধিকার আইন কার্যকর করা, সরকারি ক্রয়নীতির স্বচ্ছ বাস্তবায়ন, রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ আইন প্রনয়ণ, সরকারি ব্যাংকগুলোর পুনর্গঠন অব্যাহত রাখা, জ্বালানি খাতের জন্য স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগের বড় প্রস্তাবগুলো নিরীক্ষার জন্য কমিটি গঠন। সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংস্থাটির তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

এ সুপারিশ এর অর্থই হল এমন একটি শক্তিশালী অর্থনীতি তৈরি করা। যা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে পারে।

নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সরকারকে কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত ব্যবস্থা নিতে হবে। নির্বাচনে যাতে কালো বা অপ্রদর্শিত অর্থ এমনকি বিদেশ থেকে গোপনে অর্থ এনে ব্যবহার না হতে পারে। এ জন্য এন্ট্রি মানি লন্ডারিং আইন

প্রয়োগ করা যেতে পারে। টাকা সাদাকারী কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হলে তাঁদের নাম প্রকাশ করা উচিত। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হতে চাইলে তাঁদের সম্পর্কে জানার অধিকার জনগণের আছে। ঋণখেলাপীরা যাতে প্রার্থী হতে না পারে সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। ঋণখেলাপীর সংজ্ঞারও পরিবর্তনকরা প্রয়োজন। একবার পুনঃ তফসিল করার পর পাঁচ বছর খেলাপী হয়ে থাকা বন্ধ করতে হবে। মিথ্যা তথ্য দিয়ে নির্বাচিত হলে তার প্রার্থিতা বাতিল করার বিধান থাকতে হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরিতে সরকারকে প্রথাগত নির্বাচনী পদক্ষেপের বাহিরে যেতে হবে। এর জন্য বেশ কিছু কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করতে হবে। তিনটি প্রধান দিকের প্রতি নজর দিতে হবে। যেমন অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করা, দুর্নীতি দমন কার্যক্রম শক্তিশালী করা এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার।

নির্বাচনী আইনের সংস্কার বিষয়ে নির্বাচন কমিশন (২০০৭ সালে) খসড়া সুপারিশমালা ঃ

নির্বাচন কমিশন ২০০৭ সালে খসড়া সুপারিশমালা প্রণয়ন করে সংস্কার কার্যক্রম ও তার প্রয়োজনীয়তাকে সকলের সামনে উপস্থাপন করে। মূলত এ নির্বাচনী সংস্কার বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় অনেক ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে আসে।

নির্বাচন কমিশন যে সংস্কার প্রস্তাবগুলোর খসড়া প্রস্তুত করেছে, তা হলো[৩৫]-

ক. গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর সংশোধনীসমূহ-

নিচে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ সংশ্লিষ্ট সংশোধনীগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

১. কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা সমীচীন বলে মনে করে। সেক্ষেত্রে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রার্থীগণ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন। তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের যোগ্যতা পৃথকভাবে নিরূপণ করতে হবে। সংসদ নির্বাচনে অনেক সময় ডামি প্রার্থীরূপে

স্বতন্ত্র প্রার্থীগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং এরূপ ডামি প্রার্থীর মাধ্যমে নির্বাচনের পরিবেশ নষ্টের এ প্রবণতা রোধ করা দরকার।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

ক. নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন ছাড়া কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

খ. তবে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না এবং কোনো নির্বাচনী এলাকায় কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিলে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে ঐ নির্বাচনী এলাকার ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থনসূচক ও স্বাক্ষরসংবলিত তালিকা জমা দিতে হবে। অন্যথায় তিনি প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

গ. ভবিষ্যতে নিবন্ধনের শর্ত বলবৎ হওয়ার পর রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থীদের তিন বছরের অধিককাল কোনো দলের সদস্য না থাকলে নির্বাচনে ঐ দলের পক্ষ থেকে অংশ গ্রহণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হবে না এরূপ শর্তও সন্নিবেশ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। তবে নিবন্ধনের মেয়াদ তিন বছরের অধিক না হলে তা প্রযোজ্য হবে না।

২. অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত ঃ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সম্পর্কে বিধানবলি রয়েছে। সরকারি/বিধিবদ্ধ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরপরই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে স্বার্থের সংঘাতমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিদ্যমান আইনে এ ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ না থাকায় এর প্রতিবিধানের জন্য আইন সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর অথবা এরূপ প্রতিষ্ঠানের কোনো পদে চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োজিত থাকলে চুক্তির মেয়াদ

শেষ হওয়ার পরবর্তী দিন থেকে কমপক্ষে তিন বছর অতিবাহিত না হলে কেউ নির্বাচনের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

৩. এনজিওর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ঃ

বিদেশি অনুদান বা তহবিল গ্রহণকারী এনজিওর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো স্বার্থের সংঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। বর্তমানে এদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো বাধানিষেধ নেই। তাই কমিশন এরূপ এনজিওসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমিত বাধানিষেধ আরোপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

বিদেশী অনুদান বা তহবিল গ্রহণকারী এনজিওর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণের বা তার চাকরি শেষ হওয়ার পর পরবর্তী দিন থেকে কম পক্ষে তিন বছর অতিবাহিত না হলে কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৪. ঋণখেলাপীদের সংসদ নির্বাচনে অযোগ্যকরণ সংক্রান্ত বিধান সুস্পষ্টকরণ ঃ

ঋণখেলাপীগণ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন না। কিন্তু বিদ্যমান আইনের দুর্বলতা সুযোগ নিয়ে ঋণখেলাপীগণ বিগত নির্বাচনগুলোতে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে আরপিওর অনুচ্ছেদ ১২ এর (১) (এ) প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র দাখিলের আগে কোনো ঋণ বা ঋণের কিস্তি প্রদানে খেলাপি কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবির তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়। এ তথ্য সব সময় হালনাগাদ থাকে না, তা ছাড়া এ তথ্য সেকেন্ডারী। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকসমূহ থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। ব্যাংকের বুক অব অ্যাকাউন্টসে যিনি এক বছর আগে খেলাপী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিই খেলাপী। তা ছাড়া ইতিপূর্বে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রেই ঋণখেলাপী বলে গণ্য করা হতো, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ এ

আদেশের আওতাভূক্ত ছিল না। এ কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও এ আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

ক. মনোনয়নপত্র দাখিল করার এক বছর আগেকার তারিখ থেকে প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক / আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শাখায় রক্ষিত বুকস অব অ্যাকাউন্টস অনুযায়ী ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধিত থাকতে হবে। অন্যথায় তিনি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

খ. ঋণ খেলাপী বলতে ঋণ গ্রহীতার পাশাপাশি ওই ঋণের জামিনদার ও বন্ধকদাতাকেও বোঝাবে।

গ. সংশোধিত আইনে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণকারীদেরও অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

৫. সেবামূলক সংস্থার বিলখেলাপী ঃ

অনেক প্রার্থী বা বিগত সংসদ সদস্যদের কাছে এরূপ সংস্থাসমূহের বিপুল পরিমাণ বিল অপরিশোধিত থাকে, যা আদায় করা তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। বস্তুত দেশের আইন প্রণেতাদের আচরণ অন্যদের কাছে দৃষ্টান্তমূলক হওয়া সমীচীন বিধায় প্রার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিধান সংযোজন করা আবশ্যক বলে কমিশন মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের তিন মাস আগেকার পর্যন্ত পরিশোধযোগ্য বিল অপরিশোধিত থাকলে অনুরূপ বিলখেলাপী নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

৬. একাধিক আসনে প্রার্থিতা সংক্রান্ত ঃ

অতীতে দেখা গেছে অনেক প্রার্থী একের অধিক, এমনকি সর্বোচ্চ পাঁচটি আসনে প্রার্থী হয়েছেন। এরূপ ক্ষেত্রে একাধিক আসনে নির্বাচিত হলে পরবর্তী সময় সংবিধানের ৭১(২)(ক) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী তাকে একটিমাত্র আসন রেখে বাকি সব আসন ছেড়ে দিতে হয়। তিনি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসনগুলোতে পুনর্নির্বাচন করতে হয়। এসব পুনর্নির্বাচনে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় এবং প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সর্বোচ্চ তিনটি আসনে প্রার্থিতার সুযোগ রেখে আইন সংশোধনের প্রস্তাব করতে যাচ্ছে। তা ছাড়া কমিশন পুনর্নির্বাচনের সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি অংশ এরূপ প্রার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা সমীচীন বলে মনে করেন।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

ক. কোনো ব্যক্তি একই সময় তিনটির অধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রার্থী হতে পারবেন না।

খ. একাধিক আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করলে অতিরিক্ত প্রতিটি আসনের জন্য পাঁচ লাখ টাকা জমা দিতে হবে এবং জয়লাভ করে এরূপ আসন ছেড়ে দিলে এ জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৭. মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনের আপিল সংক্রান্ত ক্ষমতাঃ

নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য প্রার্থিতা গ্রহণ / বাতিল উভয় ক্ষেত্রে আপিল বিবেচনার এখতিয়ার কমিশনের থাকা বাঞ্ছনীয়। তা ছাড়া শুধু প্রার্থী নন, সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও এরূপ আপিলের সুযোগ দেওয়া সমীচীন। রিটার্নিং অফিসার মনোনয়নপত্র বাতিলের ক্ষেত্রে তার যুক্তি লিপিবদ্ধ করেন। গ্রহণ বা বাতিল উভয় ক্ষেত্রে এরূপ যুক্তি পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করা সমীচীন।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

ক. রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক মনোনয়নপত্র গৃহীত বা বাতিল হলে তার আদেশের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন বরাবর আপিল করা যাবে। রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো প্রার্থী বা ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সেবা প্রদানকারী সংস্থা যদি সংক্ষুব্ধ হন, তবে তারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে আপিল করতে পারবেন।

খ. মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের স্বপক্ষে রিটার্নিং অফিসার তার যুক্তি / মতামত আদেশ লিপিবদ্ধ করবেন।

গ. আপিল করা হলে অনুরূপ আপিলের ফলাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বা আপিলের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসার কোনো প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করতে পারবেন না।

৮. প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের গণনার ফলাফল প্রকাশ ও পোলিং এজেন্টদের সংখ্যা সীমিতকরণ ঃ

প্রার্থীগণ একেকটি ভোটকেন্দ্রে একটি বুথে সর্বোচ্চ দুজন এবং একাধিক বুথ থাকলে সর্বোচ্চ পাঁচজন পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করতে পারেন। এ সংখ্যা কমিয়ে চারে নামানোর যৌক্তিকতা অনুভূত হচ্ছে। তা ছাড়া ভোট কেন্দ্রের ফলাফল তাৎক্ষনিকভাবে ঘোষণা করা না হলে অনেক সময় আপত্তি উত্থাপন করা হয়। বিষয়টিতে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য ভোটকেন্দ্রের ফলাফল সেখানেই প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হচ্ছে। পাশাপাশি ভোট গণনাকালে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের ভোট গণনার কাজ পর্যবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করা সমীচীন বিবেচিত হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

ক. একটি বুথে সর্বোচ্চ দুজন এবং সার্বিকভাবে কোনো ভোটকেন্দ্রে সর্বোচ্চ চারজনের বেশি পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করা যাবে না।

খ. প্রিসাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ নির্বাচনী এজেন্ট ও পোলিং এজেন্টদের ভোট গণনার কাজ পর্যবেক্ষণ সুবিধা প্রদান করবেন এবং কেন্দ্রের ফলাফল এজেন্টদের হস্তান্তরের পাশাপাশি ভোটকেন্দ্রের দেয়ালে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৯. জামানত বাজেয়াপ্ত ঃ

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর জামানত হিসেবে প্রার্থীর জমাকৃত অর্থ জমাকারী ব্যক্তি বা তার আইনগত প্রতিনিধির নিকট ফেরত দেওয়া হয়। বর্তমান আইনে কোনো প্রার্থী নির্বাচনী এলাকার সর্বমোট ভোটের এক-অষ্টমাংশের কম ভোট পেলে তার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। এ সীমা কিছুটা বৃদ্ধি করা সঙ্গত বলে কমিশন মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

কোনো প্রার্থী নির্বাচনী এলাকার প্রদত্ত সর্বমোট ভোটের এক-পঞ্চমাংশের কম ভোট পেলে জামানত (টাকা ১০,০০০/-) বাজেয়াপ্ত হবে।

১০. প্রার্থীর নির্বাচনী আয়ের উৎস ঃ

বর্তমান আইনে কোনো প্রার্থীকে প্রার্থীতা প্রত্যাহারের দিন থেকে সাত দিনের মধ্যে সম্ভাব্য আয়ের উৎস সম্পর্কে বিবৃতি জমা দিতে হয়। অতীতে দেখা গেছে কোনো কোনো প্রার্থী তা জমা দিতে গড়িমসি করেছেন। তাই এটি মনোনয়নপত্রের সঙ্গেই জমা নেয়ার বিধান করা সমীচীন। সেই সঙ্গে তিনি যদি আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ইত্যাদি কারও কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করবেন বলে প্রত্যয়ন করেন। তাহলে এরূপ ব্যক্তি / ব্যক্তিবর্গের আয়ের উৎসের বিবরণ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত বলে কমিশন মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

প্রত্যেক প্রার্থীকে তার নির্বাচনী খরচ নির্বাহ করার জন্য সম্ভাব্য তহবিলের উৎস সম্পর্কিত একটি বিবরণী মনোনয়নপত্রের সঙ্গে নির্ধারিত ফরমে জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে স্বীয়

আয়ের বাইরে যেসব উৎস থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হবে, সেসব আয়ের উৎস সংক্রান্ত তথ্যও দিতে হবে।

১১. বিদেশি সূত্র বা রাষ্ট্র থেকে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ঃ

রাজনৈতিক দলসমূহ নির্বাচনে যে অর্থ ব্যয় করে, সে অর্থ আয়ের উৎস সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে। আরও কোনো উৎস থেকে চাঁদা পাওয়া গেলে তা প্রার্থীদের জানানোর নির্দেশনা দেওয়া দরকার এবং বাংলাদেশি বা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নন এমন কারও কাছ থেকে চাঁদা/ অনুদান গ্রহণ আইনসঙ্গত বিবেচনা করা সমীচীন হবে না।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নন এমন কারও কাছ থেকে বা কোনো বিদেশি সংস্থা বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো অনুদান বা ফান্ড গ্রহণ করতে পারবে না।

১২. রাজনৈতিক দলের নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যয়ের বিবরণী ঃ

সব রাজনৈতিক দলকে সকল আসনের বিপরীতে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে রাজনৈতিক দলের ব্যয়ের বিবরণী পৃথক পৃথকভাবে রিটার্নিং অফিসারের কাছে পেশ করতে হয়, তবে সার্বিকভাবে নির্বাচন কমিশনে এরূপ ব্যয়ের বিবরণ পাঠাতে হয় না। এরূপ বিবরণ কমিশনে দাখিল করার নিয়ম প্রচলন করা সমীচীন বলে কমিশন মনে করে।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

রাজনৈতিক দলে মহাসচিবের স্বাক্ষরে নির্ধারিত ফরমে ঐ রাজনৈতিক দলের সব নির্বাচনী আসনের সার্বিক ব্যয়ের বিবরণী নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ৬০ দিনের মধ্যে রেজিস্টার্ড ডাকযোগে নির্বাচন কমিশন বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

১৩. নির্বাচনী দলিল-দস্তাবেজ পরিদর্শন ঃ

কমিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দলিলাদি প্রার্থীদের কাছ থেকে হলফনামার মাধ্যমে গ্রহণ এবং এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করার পাশাপাশি তথ্য গোপন বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করার জন্য দন্ড আরোপ করা সমীচীন মনে করে। নতুনভাবে প্রস্তাবিত এ বিধানে অনুরূপ তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রার্থীর দাখিলাকৃত বিবরণী রিটার্ন এবং দলিল-দস্তাবেজ প্রকাশ করা হবে। যদি কেউ মনোনয়ন পত্রের সঙ্গে ভূল তথ্য প্রদান করেন বা আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণীতে ভূল তথ্য প্রদান করেন এবং তা শনাক্ত করা যায়, তবে সংশ্লিষ্ট সাংসদের সদস্যপদ বাতিল করার প্রস্তাব করা হবে।

১৪. নির্বাচনী মামলা ঃ

নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তিতে বর্তমানে বহু সময় লেগে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, এ বিলম্বের কারণে সংক্ষুব্ধ প্রার্থী বিচার প্রক্রিয়ার এমন সময়ে প্রতিকার পান, যখন তার তাৎপর্যই হারিয়ে যায়। এ সমস্যার প্রতিবিধানকল্পে নির্বাচনী মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা নির্ধারণ করে নতুন বিধান সংযোজন করার প্রস্তাব করা হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ

ক. নির্বাচনী মামলা দাখিলের তারিখ থেকে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ছয় মাসের মধ্যে সকল নির্বাচনী মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে এবং হাইকোর্টের বেঞ্চ পুনর্গঠন করা হলেও এ সময়সীমা বৃদ্ধি করা যাবে না। হাইকোর্ট এ জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ গঠন করতে পারবেন।

খ. হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল দায়ের হলে আপিল বিভাগ তা দাখিলের তারিখ থেকে দুই মাসের মধ্যে এবং লিভ টু আপিল মঞ্জুর হওয়ার তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করবেন।

গ. অন্য আইনে যেরূপ বিধানই থাকুক না কেন, মামলা প্রক্রিয়ায় সাংসদ সদস্যদের উপস্থিতির ক্ষেত্রে এ আইনের বিধানবলীকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

১৫. রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের জন্য শর্তাবলী ঃ

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করায় একাধিক সংশোধনী আনয়ন করতে হবে। এসব সংশোধনীর ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলসমূহের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র চর্চার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বচ্ছতা আনয়নসহ জনগণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

ক. নিবন্ধনের শর্তাবলি ঃ

বিদ্যমান রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত যেকোন সংসদ ঐ রাজনৈতিক দলের সদস্য অন্ততপক্ষে একটি আসন লাভ করার প্রমাণ বা তা না হলে সর্বশেষ নির্বাচনে ঐ দল কর্তৃক বা সর্বমোট প্রদত্ত ভোটের ২ শতাংশ ভোট প্রাপ্তি।

অথবা,

নতুন দল ঃ

এ শর্ত পূরণ করে না এমন রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে ঃ

১. রাজনৈতিক দলের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে অফিস থাকতে হবে, বিশেষভাবে বাংলাদেশের অর্ধেক জেলায় এবং জেলাগুলোর আওতাধীন উপজেলায় কার্যকরী কমিটি ও অফিস থাকতে হবে।

২. জেলাগুলোতে কমপক্ষে এক হাজার এবং উপজেলাগুলোতে ২০০ করে সদস্য থাকতে হবে এবং সদস্যদের নিবন্ধিত হতে হবে।

খ. নিবন্ধনের জন্য রাজনৈতিক দলকে আবেদনপত্রের সঙ্গে অন্যান্য তথ্যসহ নিম্নোক্ত তথ্যগুলোও প্রদান করতে হবে ঃ

১. ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য ঃ

রাজনৈতিক দলের নামে পরিচালিত ব্যাংক অ্যাকাউট সংক্রান্ত তথ্য (নাম ও নম্বরসহ) দেশের বাইরে অবস্থিত ব্যাংকের নাম ও অ্যাকাউন্ট নম্বরও (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে।

২. আয়ের উৎস ঃ দলের তহবিলের আয়ের বিশদ উৎস জানাতে হবে।

গ. গঠনতন্ত্র ও নির্বাচনী ইশতেহার ঃ

দরখাস্তের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রের অনুলিপি প্রদান করতে হবে। সেই সঙ্গে নির্বাচনী ইশতেহারের অনুলিপি দিতে হবে। গঠনতন্ত্রে এই মর্মে বিশেষ বিধান থাকতে হবে, দল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করে এবং তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য এবং অখন্ডতা সমুন্নত রাখবে।

ঘ. দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা ঃ

প্রত্যেক নিবন্ধনকৃত রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে তাদের জাতীয় বা স্থানীয় পর্যায়ের কমিটির/ সংগঠনের (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান থাকতে হবে এবং ঐ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে জাতীয় / স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করতে হবে।

ঙ. কেন্দ্রীয় / নির্বাহী কমিটির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা ঃ

প্রতিটি নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলকে তাদের গঠনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সম্মেলন (যে নামে অভিহিত হোক না কেন) নির্ধারিত সময়ে আয়োজন করতে হবে।

চ. অডিট ঃ

প্রত্যেক নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলকে প্রতি বছর তাদের হিসাব স্বীকৃত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট করাতে হবে এবং অডিট প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে পেশ করতে হবে।

ছ. অনিবন্ধনকৃত দলের সঙ্গে জোট গঠনে বাঁধা ঃ

নিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত প্রার্থী কোনো অনিবন্ধীকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করতে পারবে না।

জ. কোনো রাজনৈতিক দল থেকে নির্বাচিত প্রার্থী কোনো অনিবন্ধিত দলে যোগদান করলে তা ঐ অনিবন্ধিত দলের নিবন্ধনের যোগ্যতা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঝ. নিবন্ধন বাতিল ঃ

নিবন্ধীকৃত কোনো রাজনৈতিক দল যদি অবলুপ্ত হয় বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একত্রীভূত হয় এবং যদি আদেশের সংশ্লিষ্ট অংশের বিধানবলি ভঙ্গ করে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল হবে।

১৬. রাজনৈতিক দলকে প্রদত্ত দান বা উপঢৌকন কর মওকুফ সুবিধা প্রদান ঃ

রাজনৈতিক দলের পরিচালনার জন্য যে তহবিল প্রয়োজন তাতে সদস্যদের দান-অনুদানের বিষয়টি আকর্ষণীয় করার জন্য প্রণোদনা দেওয়া সমীচীন।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তন ঃ

রাজনৈতিক দলের তহবিল সংগ্রহ সহজ করার জন্য রাজনৈতিক দলকে প্রদত্ত দান-অনুদান কর মওকুফ সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করা হবে।

১৭. গুরুতর নির্বাচনী অপরাধের জন্য কমিশনকে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান ঃ

২০০১ সালে আরপিও সংশোধন করে গুরুতর নির্বাচনী অপরাধের জন্য কমিশনকে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। তবে অল্প কিছুদিন পরে এ বিধান বিলুপ্ত করা হয়। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, প্রার্থীগণ কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান উপেক্ষা করে গুরুতর নির্বাচনী অপরাধ সংঘটিত করেছেন। এ সমস্যার প্রতিবিধানের জন্য কমিশনের প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে ওই বিধান পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব করা হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ

গুরুতর নির্বাচনী অপরাধের জন্য কমিশনকে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা প্রদান করার প্রস্তাব করা হবে।

১৮. লাভজনক পদের সংজ্ঞায় সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনারদের অন্তর্ভূক্ত করা ঃ

১৯৯৬ সালে সিটি কর্পোরেশনের অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর, ডেপুটি অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরসহ ওয়ার্ড কমিশনারগণ ওই পদে থাকাকালে লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত গণ্য হবে না মর্মে এক সংশোধনী আনা হয়েছিল। এর তাৎপর্য এই যে, অনুরূপ পদে থাকাকালীন তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণের যোগ্য থাকবেন। ওই সংশোধনীর বর্তমানে কোনো তাৎপর্য নেই।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ ওই বিধান বাতিল করার প্রস্তাব করা হবে।

১৯. নির্বাচনী অপরাধের শাস্তি সংক্রান্ত বিধানবলি ঃ

নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচনী আইনের বিধিবিধান প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য দন্ডের বিধানগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন। তা ছাড়া গুরুতর বিবেচিত অপরাধের জন্য কমিশন কঠোর দন্ড আরোপের যৌক্তিকতা অনুভব করে বিধায় প্রার্থীতা বাতিলের ক্ষমতা কমিশনকে প্রদানের সুপারিশ করবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন/ পরিবর্তন ঃ

নির্বাচনী আইনের জন্য শাস্তির পরিমাণ সংশোধন করা হবে এবং তা হবে সর্বোচ্চ টাকা ২,০০,০০০/- এবং ন্যূনতম টাকা ১,০০,০০০/- তা ছাড়া কমিশন অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী নির্বাচনে প্রার্থিতা বাতিলের ক্ষমতা কমিশনকে প্রদানের সুপারিশ করবে।

২০. অন্যান্য সংশোধন ঃ

বর্তমান আইনে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণ লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত নন বলে গন্য করা হয়। তাতে স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই। আইন সংশোধন করে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। অর্থ্যাৎ এ দুটি পদ লাভজনক গন্য করা হবে না।

প্রস্তাবিত / পরিবর্তন ঃ

আইনে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের বিষয় উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করা হবে।

নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ ঃ

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর প্রস্তাবিত সংশোধনের ভিত্তিতে নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এর সংশ্লিষ্ট অংশে সংশোধনী আনয়ন করা প্রয়োজন হবে।

প্রস্তাবিত সংশোধন / পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালার যেসব ফরম রয়েছে তা প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করতে হবে।

খ. হাইকোর্ট বিচারাধীন মামলার রায়ের উপর ভিত্তি করে আটটি তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য সংযোজন করে মনোনয়নপত্র (ফরম-১) সংশোধন করা হবে।

গ. মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে।

ঘ. নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ এ বিধি ৯ এ বর্তমানে ১৫০টি প্রতীক রয়েছে। তার মধ্যে ক্রমিক নং- ১৮ এ উল্লেখিত বই ও ক্রমিক নং- ২৭ এর উল্লেখিত উট বাদ দেওয়া।

ঘ. বিধিমালার ২০ বিধিতে আপত্তিকারী প্রত্যেক প্রার্থী বা তার পোলিং এজেন্ট প্রত্যেক আপত্তির জন্য প্রিসাইডিং অফিসারের কাছে নগদ পাঁচ টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা। বর্তমানে তা দুই টাকা আছে।

গ. রাজনৈতিক দলের নিবন্ধীকরণ বিধিমালার সংশোধনী ।

৬.১০ বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে উন্নয়ন সহযোগীদের অবস্থান ঃ

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে উন্নয়ন সহযোগীদের সমর্থন ও পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন আয়োজনের পথ সহজ হবে। উন্নয়ন সহযোগীদের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা, পরামর্শ এবং রাজনৈতিক সমর্থন দেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে।

ইউএনডিপি বাংলাদেশের আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার বলেছেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সেরা নির্বাচনের আশা করছে ইউএনডিপি। নির্বাচন ভবনে ১৭টি উন্নয়ন সহযোগী দেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইউএনডিপির রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা উল্লেখ করেন। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনকে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এর মধ্যে রয়েছে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করা, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটগুলোর উন্নতি করা এবং ভোটার নিবন্ধন বাড়ানো। সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য একটি ভোটার শিক্ষা কর্মসূচিও বিবেচনাধীন রয়েছে।[৩৬]

ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার জানিয়েছেন, EU বাংলাদেশের সংস্কার এজেন্ডাকে সমর্থন করে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে যে সংস্কারের সুযোগ তৈরি হয়েছে, সেটিকে ‘বড় সম্ভাবনা’ বলে আখ্যায়িত করে মিলার বলেন, “এই সুযোগ কাজে লাগানো দরকার, এখনই সময়”।[৩৭]

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে জাতিসংঘ (UN), UNDP ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) সংস্কার কার্যক্রমের শুরু থেকেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা, নীতিগত পরামর্শ এবং রাজনৈতিক সমর্থন প্রদান করে যাচ্ছে।

৬.১১ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে ‘নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কর কমিশন’ প্রদত্ত প্রস্তাব ঃ

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে গত ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার কে কমিশন প্রধান করে ‘নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন’ গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কার্যকর

করার জন্য ও নির্বাচন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে ১৬টি ক্ষেত্রে ১৫০ সুপারিশ জানিয়েছে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। গত ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫খ্রি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে 'নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন' নিম্নোক্ত প্রস্তাব করেছে ঃ[৩৮]

সুপারিশ পত্রে বলা হয়, 'সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের পর্যালোচনা এবং অংশীজনের সঙ্গে ব্যাপক মতবিনিময় ও আমাদের সর্বোচ্চ বিবেচনার ভিত্তিতে সুপারিশগুলো প্রণয়ন করেছি।'

নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো হলো-

নির্বাচন কমিশন গঠন ঃ

নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং নাগরিক সমাজের অর্থবহ অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ প্রদান করার সুপারিশ করা হয়েছে।

বিকল্পঃ একটি স্থায়ী জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনসহ সব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগ প্রদান করা যেতে পারে, যার জন্য অবশ্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

নির্বাচন ব্যবস্থা ঃ

নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের বিধান বাতিল করা।

কোনও আসনে মোট ভোটারের ৪০ শতাংশ ভোট না পড়লে পুনর্নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন বন্ধ করা, ভোটারদের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রার্থী দেওয়া নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় নির্বাচনে 'না ভোট' এর বিধান প্রবর্তন করা।

নির্বাচনে না ভোট বিজয়ী হলে সেই নির্বাচন বাতিল করা এবং পুনঃনির্বাচনের ক্ষেত্রে বাতিল করা নির্বাচনের কোনও প্রার্থী নতুন নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারার বিধান করা।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ

দল নিরপেক্ষ, সৎ, যোগ্য ও সুনামসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করার বিধান করা।

জাতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহত্তর নির্বাচকমন্ডলীর ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার বিধান করা।

প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ ঃ

প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সর্বোচ্চ দুই মেয়াদ করা; দুইবার নির্বাচত প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের অযোগ্য করা।

একই ব্যক্তি একইসঙ্গে যাতে দলীয় প্রধান, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা হতে না পারেন তার বিধান করা।

সংসদের উচ্চকক্ষের নির্বাচন ঃ

সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে (সংখ্যানুপাতিকভাবে) রাজনৈতিক দলের সদস্য ও বিশিষ্টজনদের সমন্বয়ে ১০০টি আসন নিয়ে সংসদের উচ্চকক্ষ সৃষ্টি করা।

কমপক্ষে ৩০ শতাংশ নারীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা; বিরোধী দলকে ডিপুটি স্পিকারের পদ দেওয়া।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ চার মাস নির্ধারিত করে এবং এ মেয়াদকালে জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের সব নির্বাচন সম্পন্ন করা।

এই সরকার কর্তৃক রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিবিধানের সংস্কার এবং প্রশাসনিক রদবদলের বিধান করা।

স্থায়ী ‘জাতীয় সাংবিধানিক কাউন্সিল’ কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম চূড়ান্ত করা এবং সরকারের প্রধান ও অন্য ২০ জন উপদেষ্টাকে নিয়োগের বিধান করা।

স্থানীয় সরকার নির্বাচন ঃ

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জন্য একটি স্থায়ী ‘স্থানীয় সরকার কমিশন’ গঠন করা।

জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের আয়োজন করা।

রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন ঃ

নতুন দল নিবন্ধনের শর্ত শিথিলের জন্য ১০ শতাংশ জেলা এবং ৫ শতাংশ উপজেলা বা থানায় দলের অফিস এবং ন্যূনতম ৫ হাজার সদস্য থাকার বিধান করা।

প্রতি ৫ বছর পর পর দলের নিবন্ধন নবায়ন বাধ্যতামূলক করা।

দলের লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র, শিক্ষক ও শ্রমিক সংগঠন, ভাতৃপ্রতিম বা যেকোনও নামেই হোক না কেন, না থাকার বিধান করা।

পর পর দুটি নির্বাচনে অংশ না নিলে দলের নিবন্ধন বাতিলের বিধান বাতিল করা।

প্রবাসী পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থা ঃ

প্রবাসীদের জন্য একটি তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার করা।

প্রস্তাবিত তথ্য-প্রযুক্তির সহায়তাসূচক পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থার বাস্তবায়নকল্পে দুটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে ভোটার অ্যাপ এবং ভেরিফায়ার অ্যাপ যথাযথ ফাংশনালিটিসহ ডেভেলপ করা।

৬.১২ নির্বাচনী সংস্কারে নারী প্রসঙ্গ ঃ

নারী আন্দোলনের নেত্রীরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানাচ্ছিলেন সংসদে নারী আসন বৃদ্ধি এবং সরাসরি নির্বাচনের। সংস্কারের মাধ্যমে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে এ প্রসঙ্গগুলো অত্যন্ত জরুরী। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সুজন সভাপতি বলেন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক সংস্কার প্রয়োজন। দুর্নীতি, সন্ত্রাস, স্বেচ্ছাচারিতা ও পুরুষতন্ত্র থেকে বের হয়ে আসতে হবে। নারীদের প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব থাকতে হবে। মেয়েদের পিছিয়ে দিতে নির্বাচনের সময় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় তাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়। যার ফলে তারা সফলতার মুখ দেখতে পান না। এটা রাজনীতিবিদদের পরিকল্পিত পদক্ষেপ। দলের মধ্যে এ রকম অভ্যন্তরীণ রাজনীতি পরিহার করতে হবে। সব ক্ষেত্রে যেমন ইতিবাচক সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও তা হওয়া প্রয়োজন। দলের মধ্যে যে নারী প্রতিনিধি দেওয়া হবে এর সংখ্যা যেন পুরুষদের সংখ্যা থেকে খুব একটা কম না হয় সেদিকে খেয়াল দিতে হবে।[৩৯]

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্ঠা সুলতানা কামাল বলেন, দেশের ৫০ শতাংশ জনগোষ্ঠী নারী। আমাদের নারী নেতৃরা অনেক দিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। নির্বাচন কমিশন অনেক সংস্কার করছে যা ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে জনমনে। নারী সংক্রান্ত কি কি সংস্কার তারা করছে, সংস্কারের পদতক্ষেপগুলো কী কী, তা নারী নেতৃদের সঙ্গে আলোচনা করেও করতে পারে। তারা যেন সঠিক অধিকারটি পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।[৪০]

অন্তবর্তী সরকার ২০২৪ সালের নভেম্বরে 'নারীপক্ষ'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও মানবাধিকারকর্মী শিরিন পারভীন হককে প্রধান করে ১০ সদস্যের নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন গঠন করে। ১৯ এপ্রিল, ২০২৫ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় কমিশনের সদস্যরা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন হস্তান্তর করেছে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্যরা। সুপারিশগুলো হলো[৪১]-

১. জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৬০০ করার সুপারিশ করেছে নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন। সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় একটি সাধারণ আসন এবং নারীদের জন্য একটি সংরক্ষিত আসন থাকবে। যেখানে উভয় আসনে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন হবে;

২. প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতীয় সংসদে উচ্চকক্ষ করার সিদ্ধান্ত হলে ৫০ শতাংশ আসনে আনুপাতিক হারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যে নারী-পুরুষ প্রার্থী দেবেন তা 'জিপার' পদ্ধতিতে মনোনয়ন করবেন। যাতে প্রত্যেক দল থেকে সমান সংখ্যক নারী ও পুরুষ মনোনীত হয়। বাকি ৫০ শতাংশ আসনে নির্দলীয় ভিত্তিতে অন্যান্য গোষ্ঠীর মাঝে ৫টি নারী আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা;

৩. প্রস্তাবে আর বলা হয়, রাজনৈতিক দলের মধ্যে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক চর্চার প্রসার এবং অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা;

৪. রাজনীতিতে সামাজিক ও দুর্নীতি বিষয়ক বাধা দূর করতে বিধি প্রণয়ন করা;

৫. আরপিও-তে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ক বিধান পালন বাধ্যতামূলক করা।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। দেশের আর্থো-সামাজিক উন্নয়নে নারীদের রয়েছে ব্যাপক অবদান। সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, যেকোন প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বিগত নির্বাচনে ৭৩ থেকে ৭৪ শতাংশ নারী ভোট প্রদান করেছে। তারপরও এই নারীই শিকার হচ্ছেন বৈষম্যের। তাই জাতীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটাতে হবে।

৬.১৩ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে পরিচালিত আন্দোলন তৎপরতা ঃ

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি দেশের সকলের। স্বাধীনতার পর হতে অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচন কম বেশি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। সবগুলো নির্বাচনই যে বৈধতার প্রশ্নে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়েছে তা নয়। তাই বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে নানাবিধ আন্দোলন তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে। এতে সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন, আন্তর্জাতিক মহল যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে আন্দোলন লক্ষ্য করা যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল আন্দোলনের ফসল। কিন্তু তখনও তা সংবিধানের অংশ ছিল না। ১৯৯৪ সালে আবার আন্দোলন জোড়ালো হয় এবং ১৯৯৬ সালে ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে যুক্ত হয়। এটি ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের একটি মাইল ফলক।

২০০৬-২০০৮ সালে ছবি সহ ভোটার তালিকা প্রবর্তনে জনমনে অনেক আস্থা সৃষ্টি হয়। এ সময় আইনি কাঠামোর সংস্কার করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হয়। নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা সংস্কারের ফলে নির্বাচনী প্রচারণায় গুণগত পরিবর্তন আসে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ।

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দলগুলোর অনেক প্রস্তাবনা রয়েছে, আলোচ্য গবেষণায় পূর্বে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। ১৫তম সংশোনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপক প্রতিবাদ

জানায় এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি জানায়। পরবর্তিতে এ সংশোধনী বাতিল হয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তিত হয়।

আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে সিভিল সোসাইটির আন্দোলন, দাবি ও কার্যক্রম উঠে এসেছে। বিশেষ করে সুজনের প্রস্তাবনা, সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টিতে সিপিডি-র সুপারিশ, টিআইবি ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। সংস্কার কার্যক্রমে তারা সবসময়ই সোচ্চার ছিল। জনগণের দৃষ্টিও আকর্ষণে সংগঠনগুলো সক্ষম হয়েছিল।

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে উন্নয়ন সহযোগীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে জাতিসংঘ (UN), UNDP ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) সংস্কার কার্যক্রমের শুরু থেকেই সমর্থন প্রদান করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার আন্দোলনে দেশের সকল স্তরের মানুষ আজ একমত। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করলে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মনীতি মেনে চলতে বাধ্য হবে, দলের আয়-ব্যয় সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সকলেই মনে করেন শুধু নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার করে এবং আচরণ বিধি তৈরি যথেষ্ট নয়, এ আচরণ বিধি যাতে কঠোরভাবে মেনে চলা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং দেশের সকলের সহযোগিতা থাকবে। রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব হচ্ছে, এ পুরো প্রক্রিয়াটিকে আন্তরিকতা, দায়িত্বশীলতা ও সততার সঙ্গে গ্রহণ করা। তারা যেন যুক্তি ও তথ্য দিয়ে সংস্কার প্রসঙ্গে আলোচনা করে এবং শেষ পর্যন্ত একটি ঐকমত্যে পৌঁছায়, যার ভিত্তিতে তারা নিজেদের মধ্যে এমন একটি চুক্তি ও অঙ্গীকারে উপনীত হবে, জনগণের ভোটের বাইরে কোনো নির্বাচন কেউ মানবে না। সবাই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে। নতুন সংসদে প্রস্তাব পাশের মাধ্যমে সংবিধান ও

প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধন করে এগুলো নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের উদ্দেশ্যে আমাদের শাসন কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করবে। তাহলেই সংস্কার ও নির্বাচনের মধ্যে একটি কার্যকর সমন্বয় সাধিত হবে এবং সংস্কার ও নির্বাচন নিয়ে সূচিত ঐকমত্য ভবিষ্যতের বাংলাদেশে বৃহত্তর রাজনৈতিক ঐক্য ও ঐকমত্যের পথ প্রশস্ত করবে।[৪২]

প্রকৃত গণতন্ত্রের জন্য বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার জরুরী। এ সংস্কার প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক। তা না হলে রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে না। অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার আন্দোলনে সিভিল সোসাইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁরা যেমন ছিলেন আপোষহীন, তেমনি স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে, স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বদা সকলকে নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তা ফুটে উঠেছে।

৬.১৪ তথ্যপুঞ্জী ঃ

১. Hossain, Mohammad Sohrab, *Role of Opposition in Democratic Politics: A Study with Special Reference to Bangladesh Jatiya Sangsad (1991-2006)*, Ph.D. Thesis, Dhaka University, p.28-29

২. মহাপাত্র, অনাদিকুমার. (২০০২). *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান* কলকাতা. পৃ.৮৫২

৩. Hossain, Mohammad Sohrab. (2008). Ninth jatiya sangsad election 2008 and win of Awami League an assessment, *Bangladesh Political Science Review*, Volume 6, Number 1, Dhaka, December 2008, p.105

৪. বাংলা পিডিয়া

৫. চক্রবর্তী, দেবাশিষ পৃ.১৭৫

৬. দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (এপ্রিল ২০১৩), ধারা ৬৫(২)

৮. সরকার, দিলীপ কুমার. (২৯ এপ্রিল, ২০২৪). আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বভিত্তিক নির্বাচন এখন সময়ের দাবি. *দৈনিক যুগান্তর*.

৯. আউয়াল, কাজী হাবিবুল. (১৭ আগষ্ট, ২০২৪). সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির সরকার. *দৈনিক সমকাল*.

১০. *প্রাগুক্ত*

১১. *প্রাগুক্ত*

১২. তৈয়ব, ফয়েজ আহমেদ, (৮ নভেম্বর, ২০২৪). আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বঃ দেশের নির্বাচনব্যবস্থায় প্রয়োগ করা কি সম্ভব. *প্রথম আলো*.

১৩. আউয়াল, কাজী হাবিবুল, *প্রাগুক্ত*

১৪. সরকার, দিলীপ কুমার, *প্রাগুক্ত*

১৫. আউয়াল, কাজী হাবিবুল, *প্রাগুক্ত*

১৬. *প্রাগুক্ত*

১৭. উৎসঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইট (২৬-৫-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত), https://www.ecs.gov.bd/page/national-parliament-election-law

১৮. Jahan, Rounaq. (1980). *Bangladesh Politics: Problebs and Issues*. University Press. Dhaka. p.200

১৯. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইট (৩-১০-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত), https://www.ecs.gov.bd/page/political-parties

২০. দৈনিক যুগান্তর, ১৫ নভেম্বর ২০২৪

২১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এর ওয়েবসাইট, https://jamaat-e-islami.org/article-details.php?category=80&article=2466)

২২. আলম, মুহাম্মদ জহিরুল. অপ্রকাশিত এম ফিল থিসিস

২৩. মামুন, মুনতাসির ও রায়, জয়ন্তকুমার. (২০০৮). বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, ফখরুল চৌধুরী সম্পাদিত, *সিভিল সোসাইটি তত্ত্ব প্রয়োগ ও বিচার*. কথা প্রকাশ. পৃ. ৮২

২৪. Adam, Seligman. (1993). *The Idea of Civil Socity*, New York, Free Press

২৫. হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার. *গণতন্ত্র ও সিভিল সমাজ চাওয়া পাওয়ার হিসাব*, অরুপরাহী সম্পাদিত, সিভিল সোসাইটি রাজনৈতিক পর্যালোচনা, লোকজ, ঢাকা, পৃ. ৬২

২৬. রহমান, দিলারা ও হক, মোঃ আসিরুল. *সিভিল সোসাইটি ও বাংলাদেশ*, তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, পৃ.৩৩৫

২৭. মামুন, মুনতাসির ও রায়, জয়ন্তকুমার. (১৯৯৫). *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনী. ঢাকা

২৮. দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৯ জুলাই, ১৯৯৭

২৯. Salman, L.M and Anheir, H.K. (1998). *Socity Origins of Civil socity: Explaining the Non Profit Sector Cross Nationality Volustirs*. Vol-9. p. 213-248

৩০. রহমান, দিলারা ও হক, মোঃ আসিরুল, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৩৩৯-৩৪০

৩১. রনো, হায়দার আকবর, (২৮ মার্চ, ২০০৮). সিভিল সোসাইটি ও আজকের বাংলাদেশ. *সাপ্তাহিক ২০০০*, বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪৬, পৃ. ২০

৩২. রহমান, দিলারা ও হক আসিরুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৩৩. রহমান, ড. আতাউর, *নাগরিক সমাজ ও সুশাসন*, ফকরুল চৌধুরী সম্পাদিত. (২০০৮). সিভিল সোসাইটি তত্ত্ব, প্রয়োগ ও বিচার. কথা প্রকাশ. ঢাকা. পৃ. ১১২-১২৩

৩৪. দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ জানুয়ারি ২০০৭

৩৫. দৈনিক প্রথম আলো, ৭ এপ্রিল ২০০৭

৩৬. আমার বার্তা অনলাইন, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫,
https://amarbarta.com/national/42292

৩৭. কালবেলা ডেস্ক, ০৫ মে ২০২৫

৩৮. বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট, ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

৩৯. দৈনিক প্রথম আলো, ৩০ মে ২০০৭

৪০. *প্রাগুক্ত*

৪১. বি এস এস নিউজ, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল, ২০২৫,
https://www.bssnews.net/bangla/national/192155

৪২. পারভেজ, ড. মাহফুজ. (২৭ জানুয়ারি, ২০২৫). সংস্কারের সীমা-পরিসীমা. *দৈনিক যুগান্তর*.

সপ্তম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ

সপ্তম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ

আলোচ্য গবেষণা কর্মটিতে গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নির্বাচিত প্রশ্নমালার আলোকে সাধারণ জনগণের মতামত জরিপের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির একটি অংশ। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে নাগরিকগণ কি ভাবছেন এবং সংস্কার প্রসঙ্গে তাঁদের মনোভাব ফুঁটে উঠেছে। সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৭.১ উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

জরিপে ১০০ জন উত্তরদাতা অংশগ্রহণ করেন। উত্তরদাতাদের বয়স সীমা ১৮-৭৭ বছর পর্যন্ত। টেবিল ৭.১ অনুযায়ী সর্বোচ্চ সংখ্যক ৩২% উত্তরদাতা হলেন ২৮-৩৭ বছর বয়স শ্রেণীর মধ্যে। তারপর ৪৮-৫৭ বছর বয়স শ্রেণীর ২৭%। সবচেয়ে কম সংখ্যক উত্তরদাতা ছিলেন ৬৮-৭৭ বছর বয়স শ্রেণীর ২%।

টেবিল: ৭.১

উত্তরদাতাদের বয়সসীমা

বয়সসীমা	শতকরা হার
১৮-২৭	১২%
২৮-৩৭	৩২%
৩৮-৪৭	২১%
৪৮-৫৭	২৭%
৫৮-৬৭	৬%
৬৮-৭৭	২%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১

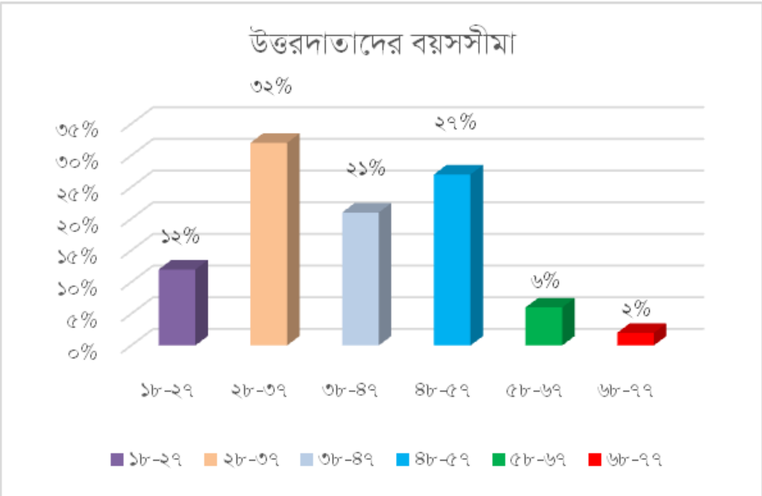

৭.২ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়

টেবিল: ৭.২

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৫%
না	৮৬%
মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই	৯%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ২

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৮৬জন উত্তরদাতা মনে করেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় না। ৫% উত্তরদাতা মনে করেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়। ৯% উত্তর দাতা কোন মন্তব্য করেনি। উত্তরদাতাদের অভিমত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন।

৭.৩ বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা যথাযথ

টেবিল: ৭.৩

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৭%
না	৯৩%
মোট	১০০%
না হলে মন্তব্য	
নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার প্রয়োজন	৬২%
নির্বাচনী আইনগুলো যথাযথ প্রয়োগ হলেই চলবে	১৩%
গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে	১৮%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৩

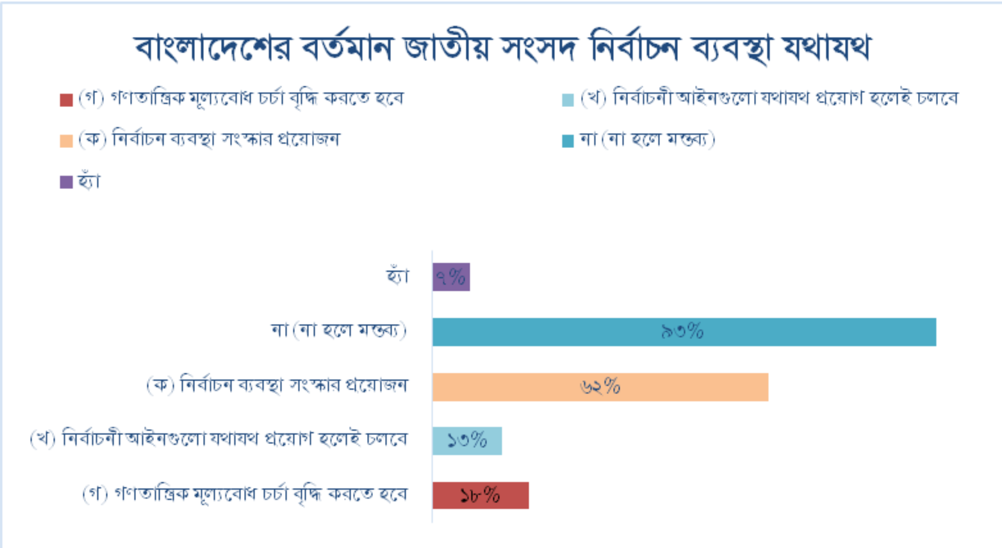

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা যথাযথ কি না প্রশ্নের উত্তরে ৯৩% উত্তরদাতা মনে করেন যথাযথ নয়। তাদের মধ্যে ৬২% মনে করেন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার প্রয়োজন, ১৩% মনে করেন নির্বাচনী আইনগুলো যথাযথ প্রয়োগ হলেই চলবে, ১৮% উত্তরদাতা মনে করেন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যদিকে মাত্র শতকরা ৭% উত্তরদাতা মনে করেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা যথাযথ। অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের পক্ষে ব্যাপক জনমত রয়েছে।

৭.৪ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার যে দিকটি সবচেয়ে বেশি সংস্কারের প্রয়োজন

টেবিল: ৭.৪

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা	৫৫%
ভোটারদের নিরাপত্তা	২৪%
নির্বাচনে কালোটাকার ব্যবহার	২১%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৪

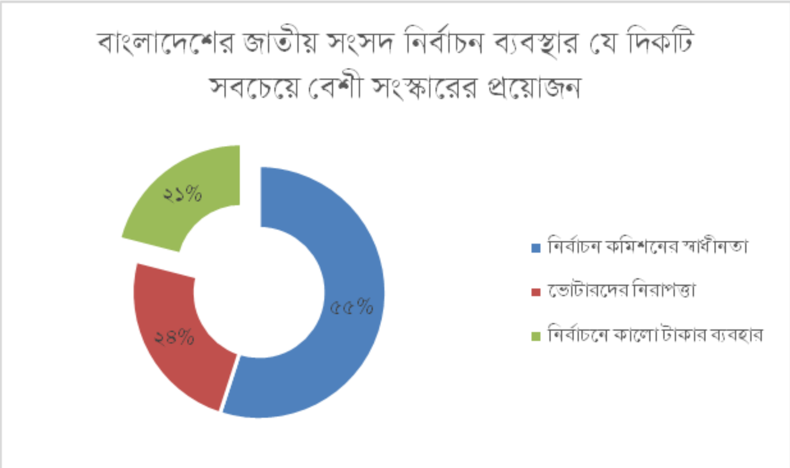

এ প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৫৫% উত্তরদাতা মনে করেন নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা সংস্কার করে নিশ্চিত করতে হবে। ২৪% ভোটারদের নিরাপত্তার কথা বলেছেন এবং ২১% নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার বন্ধ করতে বলেছেন। এখানে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

৭.৫ নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ রয়েছে

টেবিল: ৭.৫

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৮২%
না	৫%
মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই	১৩%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৫

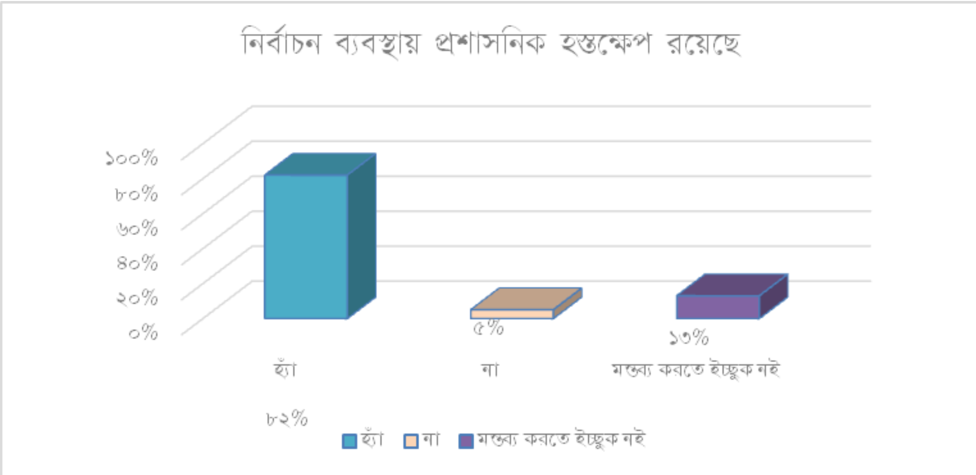

নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ রয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৮২% উত্তরদাতা হ্যাঁ বলেছেন। ৫% উত্তরদাতা না বলেছেন এবং ১৩% মন্তব্য করেনি। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রশাসনের প্রভাবমুক্ত রাখা প্রয়োজন।

৭.৬ নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্বাসের মাত্রা কতটা

টেবিল: ৭.৬

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য	৩%
কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য	৫২%
মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নই	৪৫%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৬

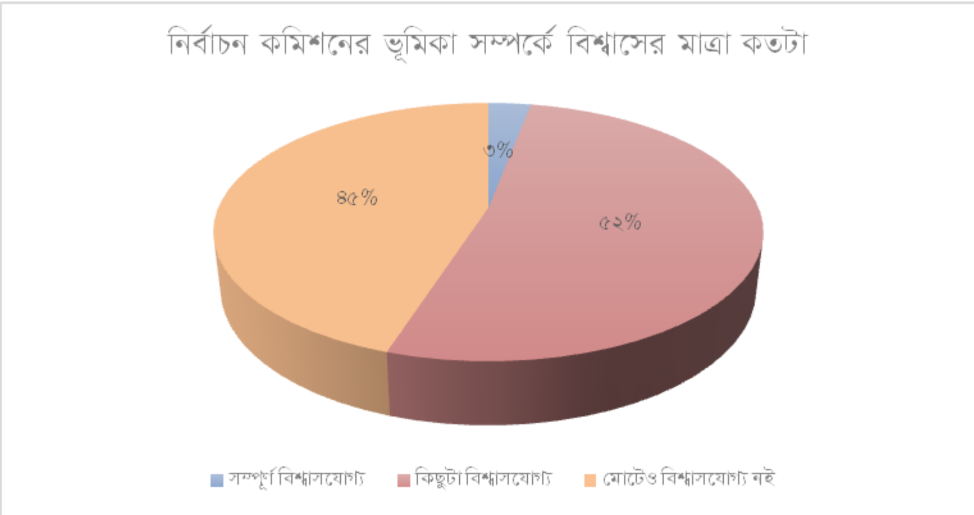

আলোচ্য প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৫২% উত্তরদাতা নির্বাচন কমিশনের উপর বিশ্বাস রাখেন। কিন্তু শতকরা ৪৫% উত্তরদাতার নির্বাচন কমিশনের উপর মোটেও বিশ্বাস রাখতে পারছেননা। মাত্র ৩% উত্তরদাতার নির্বাচন কমিশনের উপর বিশ্বাস রয়েছে। যা নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের উপর জোড় দেয়।

৭.৭ সুষ্ঠু নির্বাচনে প্রার্থীদের আর্থিক স্বচ্ছতার বিষয়টির গুরুত্ব

টেবিল: ৭.৭

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ	৬৯%
কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ	৯%
গুরুত্বপূর্ণ নয়	১৬%
মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই	৬%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৭

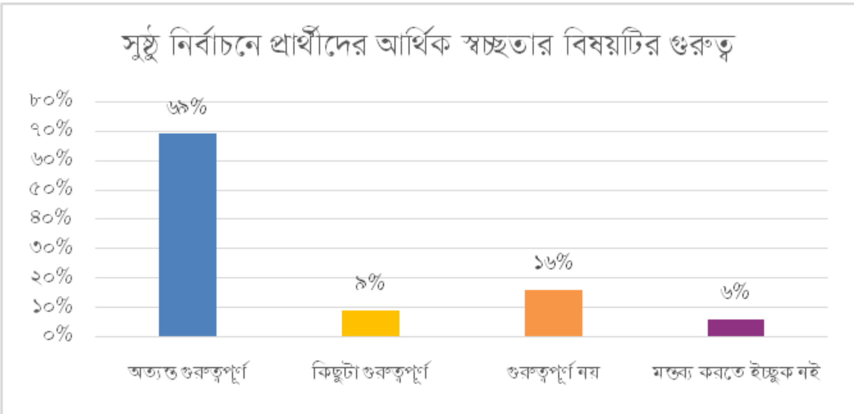

সুষ্ঠু নির্বাচনে প্রার্থীদের আর্থিক স্বচ্ছতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন শতকার ৬৯% উত্তরদাতা। ৯% উত্তরদাতা মনে করেন কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ, ১৬% উত্তরদাতা গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে মনে করেন। প্রশ্নে ৬% উত্তরদাতা উত্তর দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন।

৭.৮ নির্বাচনে অবৈধ অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য

টেবিল: ৭.৮

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদগণ কালো টাকার কাছে পরাজিত হচ্ছেন	৭০%
নির্বাচনে কোন অবৈধ অর্থ ব্যয় করা হয় না	৫%
নির্বাচনে অবৈধ ব্যয় রোধে রাজনৈতিক দলগুলো আন্তরিক নয়	২৫%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৮

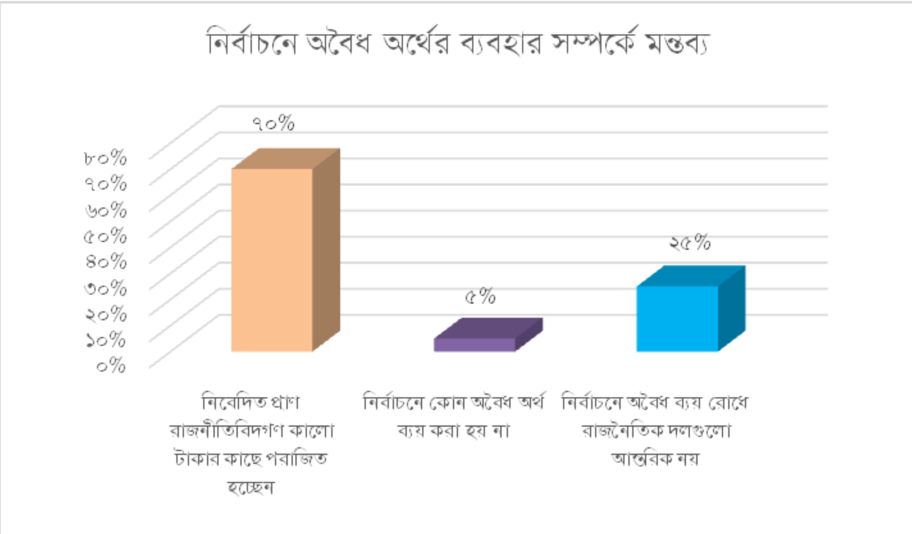

নির্বাচনে অবৈধ অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রশ্ন করলে শতকরা ৭০% উত্তরদাতা মন্তব্য করেন নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদগণ কালো টাকার কাছে পরাজিত হচ্ছেন। ২৫% উত্তরদাতা মনে করেন, নির্বাচনে অবৈধ ব্যয় রোধে রাজনৈতিক দলগুলো আন্তরিক নয়, আবার ৫% উত্তরদাতা মনে করেন নির্বাচনে কোন অবৈধ অর্থ ব্যয় করা হয় না।

৭.৯ নির্বাচনে পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার

টেবিল: ৭.৯

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
প্রশাসনের সহযোগিতায় পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয়	৪৫%
প্রশাসনিক ও আইনের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয়	৫১%
পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয় না	৪%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ৯

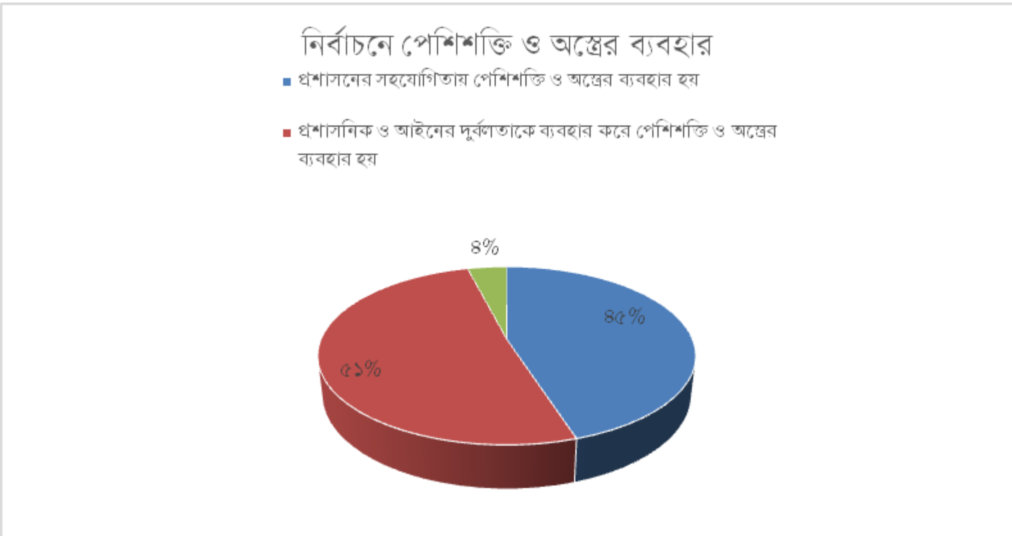

নির্বাচনে পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন করলে শতকরা ৫১% উত্তরদাতা মনে করেন প্রশাসনিক ও আইনের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয়। অন্যদিকে শতকরা ৪৫% উত্তরদাতা মনে করেন প্রশাসনের সহযোগিতায় পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয় এবং ৪% উত্তরদাতা মনে করেন পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয় না।

৭.১০ রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কতটা স্বচ্ছ

টেবিল: ৭.১০

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
সম্পূর্ণ স্বচ্ছ	১%
কিছুটা স্বচ্ছ	২৩%
মোটেও স্বচ্ছ নয়	৬৬%
মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই	১০%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১০

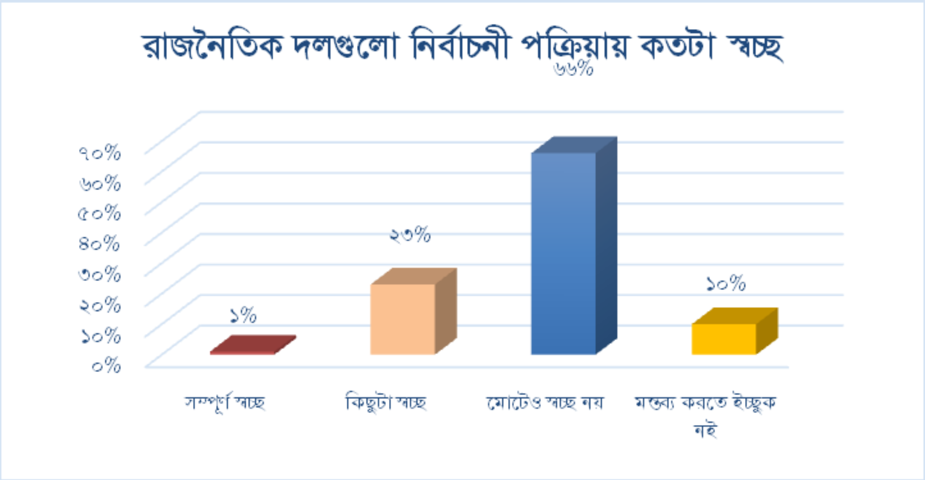

আলোচ্য প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৬৬% উত্তরদাতা মনে করেন রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় মোটেও স্বচ্ছ ভূমিকা পালন করে না। শতকরা ২৩% কিছুটা স্বচ্ছ এবং ১% উত্তরদাতা মনে করেন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। ১০% উত্তরদাতা মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নন।

৭.১১ নির্বাচনী দুর্নীতির প্রভাব কোথায় পড়ে

টেবিল: ৭.১১

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে	৮৩%
শুধুমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থার উপর	৪%
সংখ্যালঘুদের উপর	৩%
শাসন ব্যবস্থার উপর	১০%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১১

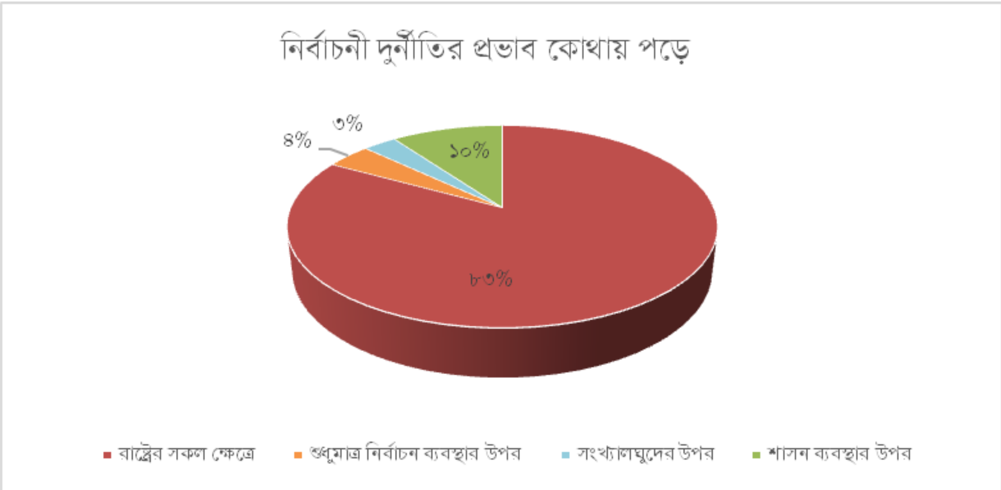

নির্বাচনী দুর্নীতির প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে শতকরা ৮৩% উত্তরদাতা মনে করেন রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ে। শতকরা ১০% উত্তরদাতা মনে করেন শাসন ব্যবস্থার উপর, ৪% শুধুমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থার উপর, ৩% সংখ্যালঘুদের উপর ।

৭.১২ নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন করা উচিত

টেবিল: ৭.১২

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৯১%
কিছুটা কঠোর আইন করা উচিত	৮%
না	১%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১২

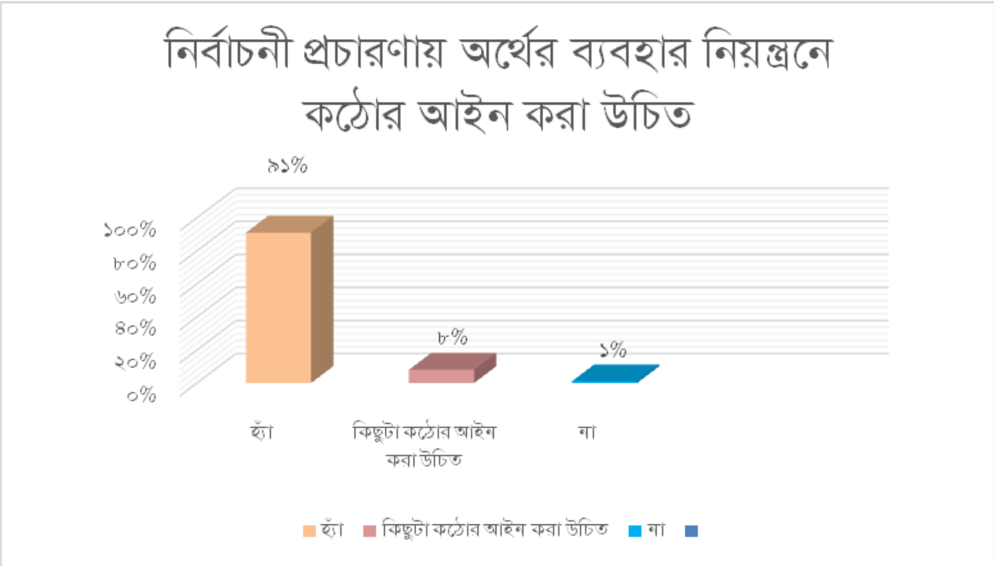

নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে শতকরা ৯১% উত্তরদাতা হ্যাঁ মন্তব্য করেন। ৮% উত্তরদাতা কিছুটা কঠোর আইন করা উচিত বলে মন্তব্য করেন এবং ১% উত্তরদাতা না মন্তব্য করেন।

৭.১৩ ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটদানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে যে বিষয়টি জরুরী

টেবিল: ৭.১৩

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা	৪৬%
নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা	৩৩%
ভোটারদের সাহসী মনোভাব	২১%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৩

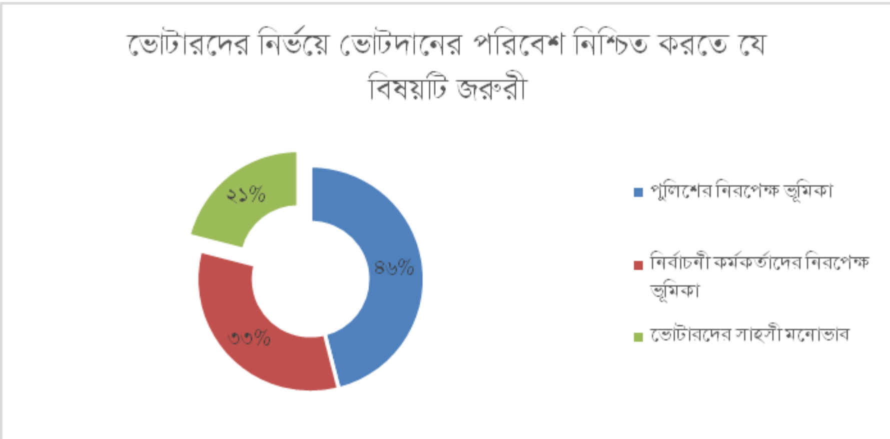

ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটদানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে কোন বিষয়টি জরুরী প্রশ্ন করলে শতকরা ৪৬% উত্তরদাতা মন্তব্য করেন পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা। ৩৩% নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকার কথা বলেন এবং ২১% ভোটারদের সাহসী মনোভাব কে জরুরী মনে করেন।

৭.১৪ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হবে

টেবিল: ৭.১৪

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৪৫%
না	৩৫%
মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই	২০%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৪

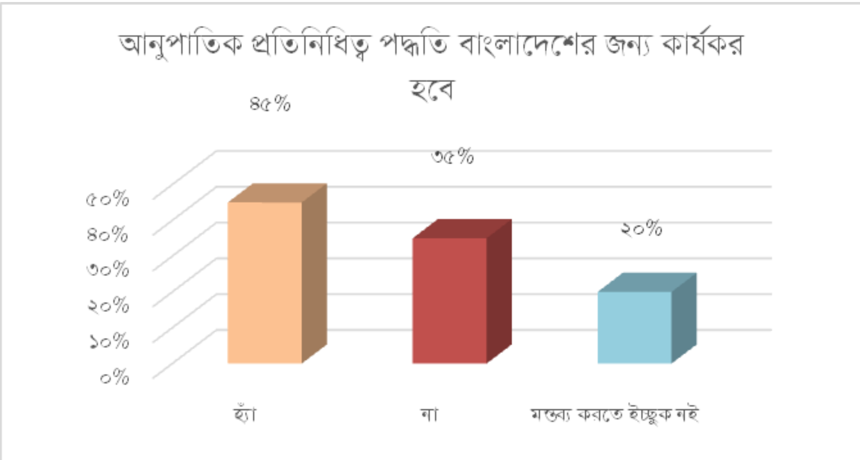

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৪৫% উত্তরদাতা হ্যাঁ মন্তব্য করেন। ৩৫% উত্তরদাতা না মন্তব্য করেন এবং ২০% উত্তরদাতা মন্তব্য করেননি।

৭.১৫ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন

টেবিল: ৭.১৫

মন্তব্য	উত্তর দাতার শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৫%
না	১২%
মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই	১৩%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৫

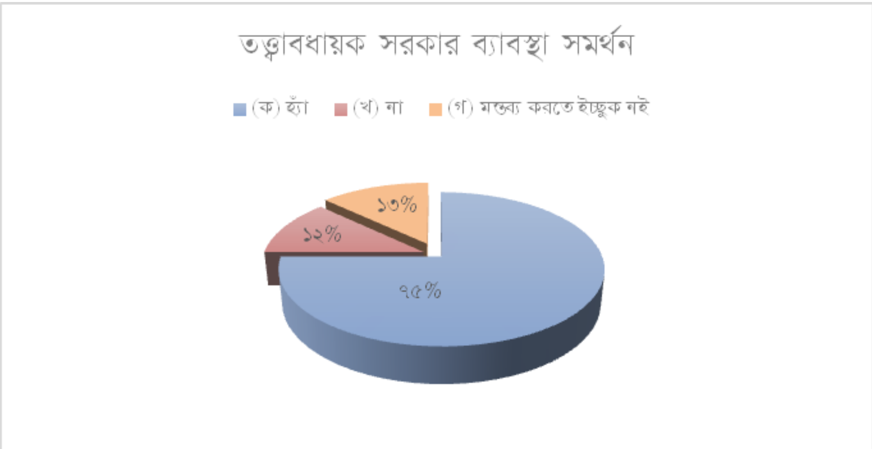

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করেন কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৭৫% উত্তরদাতা হ্যাঁ মন্তব্য করেন। ১২% উত্তরদাতা না মন্তব্য করেন এবং ১৩% উত্তরদাতা মন্তব্য করেননি।

৭.১৬ নির্বাচনী সংস্কারের জন্য সবচেয়ে জরুরী পদক্ষেপ

টেবিল: ৭.১৬

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন	৪৯%
নির্বাচন আইন সংস্কার	২৫%
রাজনৈতিক সদিচ্ছা	২৬%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৬

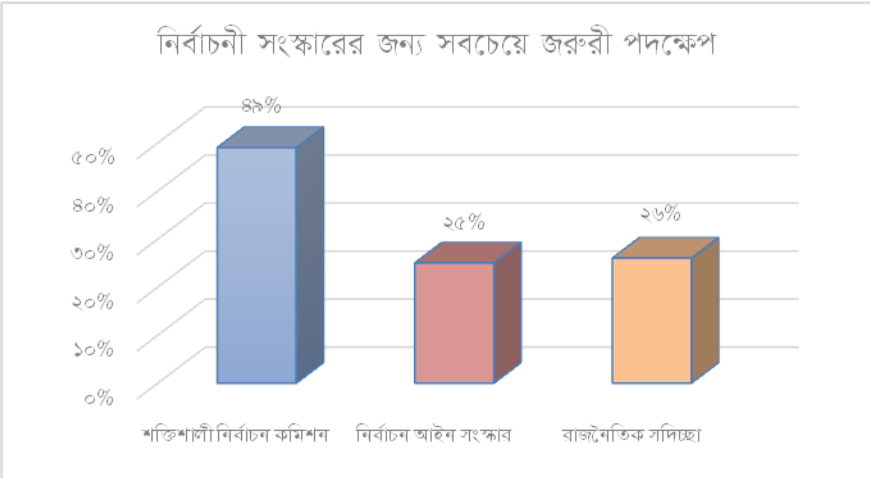

আলোচ্য প্রশ্নের জবাবে নির্বাচনী সংস্কারের জন্য সবচেয়ে জরুরী পদক্ষেপ হিসেবে শতকরা ৪৯% উত্তরদাতা শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন এর কথা বলেন, ২৫% উত্তরদাতা নির্বাচন আইন সংস্কারের কথা বলেন এবং ২৬% উত্তরদাতা রাজনৈতিক সদিচ্ছার কথা বলেন।

৭.১৭ নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য যে ধরনের সংস্কার প্রয়োজন

টেবিল: ৭.১৭

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
নির্বাচন কমিশনের আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি	৫৭%
রিটার্নিং অফিসারের নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিবর্তন	১২%
নির্বাচন কমিশনের কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা	৩১%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৭

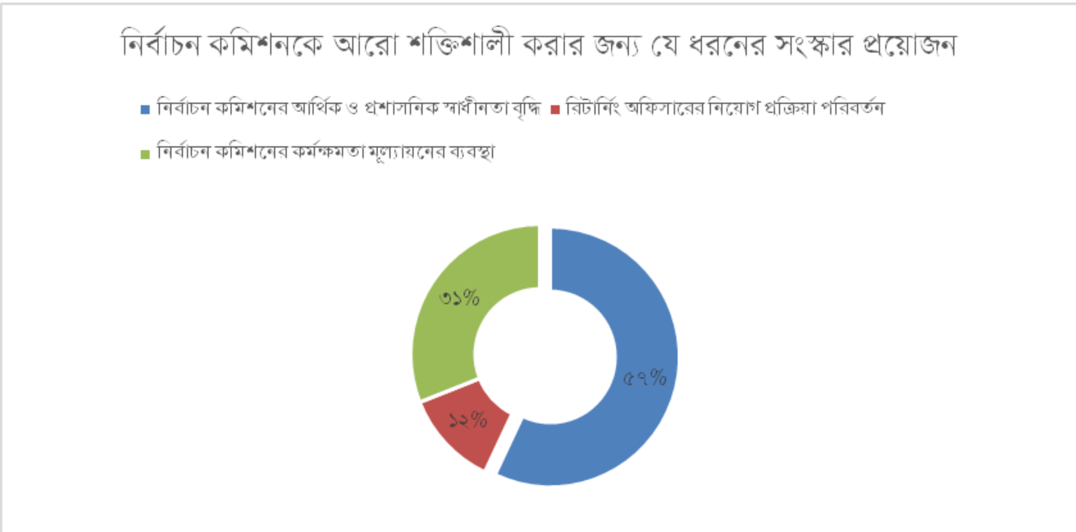

নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য নির্বাচন কমিশনের সংস্কার প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শতকরা ৫৭% উত্তরদাতা নির্বাচন কমিশনের আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি করার কথা বলেন। ৩১% উত্তরদাতা নির্বাচন কমিশনের কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করার কথা বলেন এবং ১২% উত্তরদাতা রিটার্নিং অফিসারের নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিবর্তন এর কথা বলেন।

৭.১৮ নির্বাচনী আইন লংঘনের জন্য শাস্তির বিধান কি থাকা উচিত

টেবিল: ৭.১৮

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
কারাদন্ড	৪৫%
অর্থদন্ড	৫%
নির্বাচনে অযোগ্যতা	৫০%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৮

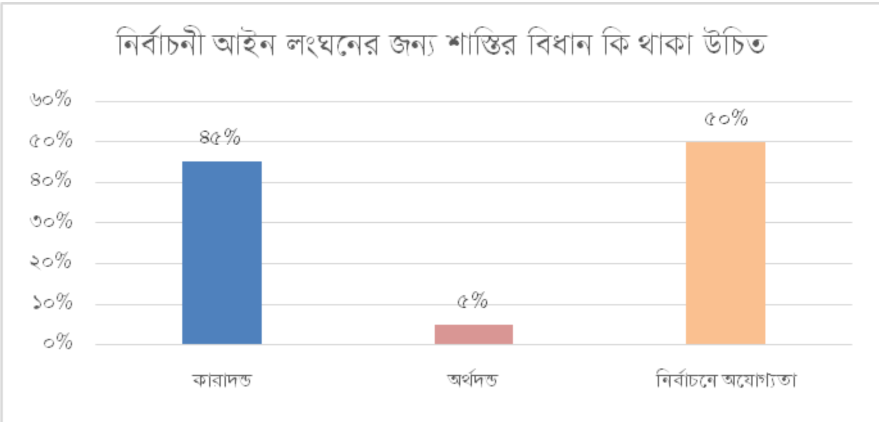

নির্বাচনী আইন লংঘনের জন্য শাস্তির বিধান এর ক্ষেত্রে শতকরা ৫০% উত্তরদাতা নির্বাচনে অযোগ্যতার কথা বলেন, ৪৫% উত্তরদাতা কারাদন্ডের কথা বলেন এবং ৫% উত্তরদাতা অর্থদন্ডের কথা বলেন।

৭.১৯ বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় নারী ও সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণের সুযোগ যথেষ্ট

টেবিল: ৭.১৯

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
হ্যাঁ যথেষ্ট	৩৬%
কিছুটা যথেষ্ট	৩১%
যথেষ্ট নয়	৩৩%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ১৯

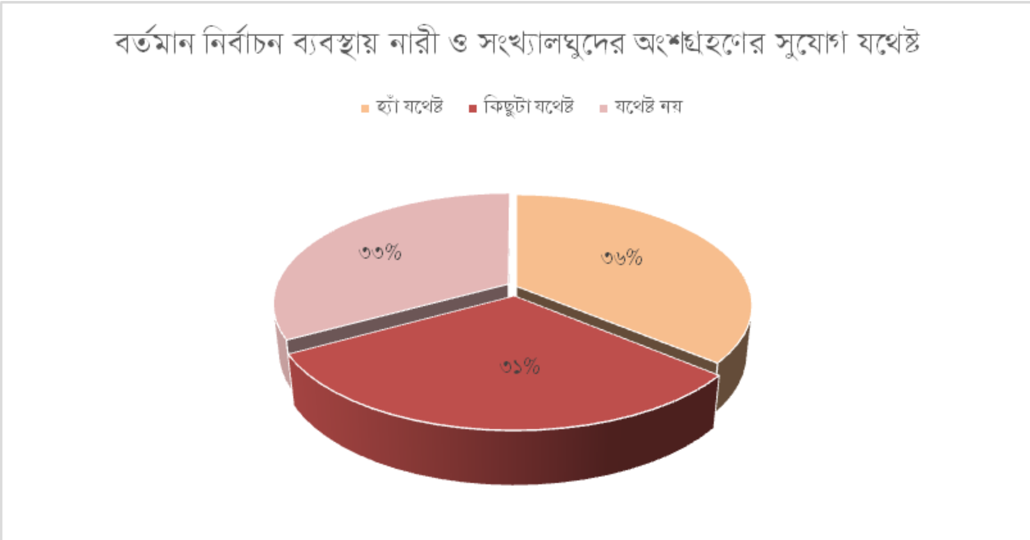

বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় নারী ও সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণের সুযোগ নিয়ে প্রশ্ন করলে শতকরা ৩৬% উত্তরদাতা নির্বাচনে হ্যাঁ যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেন, ৩৩% উত্তরদাতা যথেষ্ট নয় বলে মন্তব্য করেন এবং ৩১% উত্তরদাতা কিছুটা যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেন ।

৭.২০ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং (EVM) ব্যবহার

টেবিল: ৭.২০

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য	৪৮%
নিদিষ্ট কিছু কেন্দ্রে গ্রহণযোগ্য	২৪%
গ্রহণযোগ্য নয়	২৮%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ২০

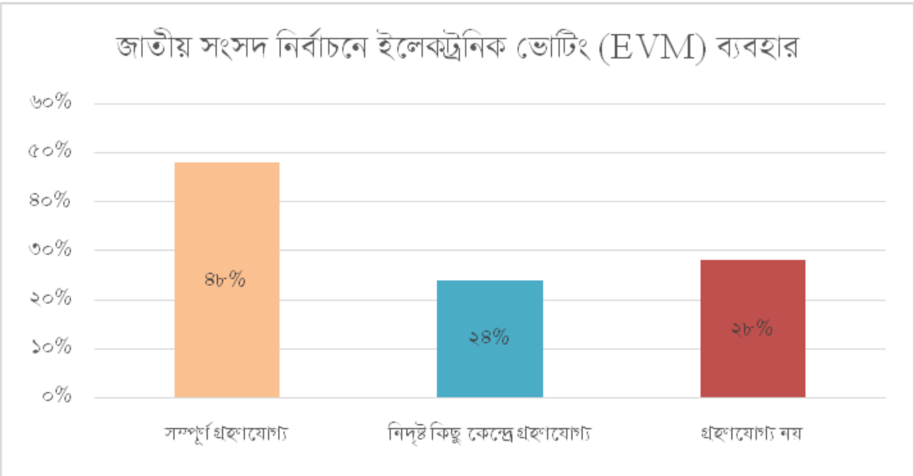

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং (EVM) ব্যবহার কতটা গ্রহণযোগ্য এমন প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৪৮% উত্তরদাতা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে করেন, ২৮% উত্তরদাতা গ্রহণযোগ্য নয় মনে করেন এবং ২৪% উত্তরদাতা নির্দিষ্ট কিছু কেন্দ্রে গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

৭.২১ নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া আরো স্বচ্ছ করা যেতে পারে

টেবিল: ৭.২১

মন্তব্য	উত্তরদাতার শতকরা হার
ফলাফল ঘোষণার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা	৪৯%
আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দ্বারা মনিটরিং করা	১০%
ভোটগণনার প্রক্রিয়া সরাসরি সম্প্রচার করা	৩৯%
অন্যান্য (বিশেষভাবে উল্লেখ করুন)	২%
মোট	১০০%

গ্রাফ: ২১

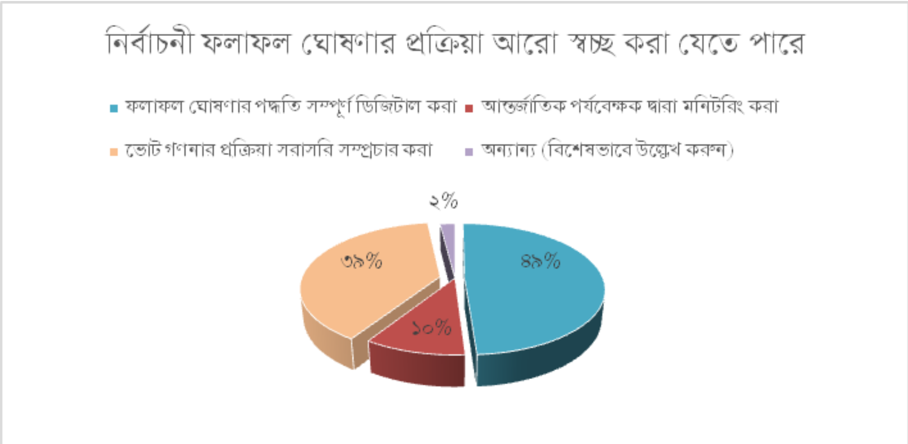

আলোচ্য প্রশ্নের জবাবে শতকরা ৪৯% উত্তরদাতা মনে করেন ফলাফল ঘোষণার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা যেতে পারে। শতকরা ৩৯% উত্তরদাতা ভোটগণনার প্রক্রিয়া সরাসরি সম্প্রচার করার কথা বলেন। শতকরা ১০% উত্তরদাতা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দ্বারা মনিটরিং করার কথা বলেন এবং শতকরা ২% উত্তরদাতা এর বাইরে অন্যকিছু হতে পারে বলে মনে করেন।

“বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ” শীর্ষক গবেষণায় পরিচালিত জরিপে বিভিন্ন বয়স, পেশা ও দৃষ্টিভঙ্গির নাগরিকগণ অংশগ্রহণ করেছেন। প্রধান ফলাফলসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়:

নির্বাচনী ব্যবস্থার বিষয়েঃ

৮৬% অংশগ্রহণকারী মনে করেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় না। ৯% কোন মন্তব্য করেন নি।

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়েঃ

৯৩% উত্তরদাতা মনে করেন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা যথাযথ নয়। তাদের মধ্যে ৬২% মনে করেন নির্বাচনী ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। ৫৫% উত্তরদাতা স্বাধীন নির্বাচন কমিশন চায়। ৮২% উত্তরদাতা মনে করেন নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ হয়। ৫১% মনে করেন প্রশাসনিক ও আইনের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে নির্বাচনে পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয়। ৮৩% উত্তরদাতা মনে করেন নির্বাচনী দুর্নীতির প্রভাব রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে পড়ে।

ভোটারদের আস্থাঃ

৪৫% উত্তরদাতা মনে করেন নির্বাচন কমিশনের প্রতি মোটেও বিশ্বাস নেই। ৬৯% মনে করেন প্রার্থীদের আর্থিক স্বচ্ছতার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৭০% উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদগণ কালো টাকার কাছে পরাজিত হচ্ছেন ।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিঃ

৪৫% উত্তরদাতা বাংলাদেশের জন্য কার্যকর মনে করেন, কিন্তু ৩৫% কার্যকর মনে করেন না। ২০% মন্তব্য করেন নি।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন:

৭৫% তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন।

প্রযুক্তির ব্যবহার:

৪৮% ইভিএম ব্যবহারে সমর্থন জানিয়েছেন, তবে ২৮% বিরোধিতা করেছেন। ২৪% বলেছেন শর্তসাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

জরিপে অংশগ্রহণকারীগণ স্পষ্টভাবে নির্বাচনী সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। সংস্কার হলে নির্বাচনে জনগণের আস্থা ফিরবে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সুদৃঢ় হবে। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়ে সবাই একমত হয়েছেন। সংস্কার হলে নির্বাচনে স্বচ্ছতা আসবে, রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী আইন মেনে নিয়ন্ত্রিত আচরণ করবে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে স্থিতিশীল করতে হলে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের বিকল্প নেই।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠিত হয় জনগণের সার্বভৌমত্বের নীতির ভিত্তিতে। জনগণ ভোট প্রদানের মাধ্যমে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমেই জনগণ পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ না হলে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থাৎ নিজ মতামতের প্রতিফলন ঘটে না। তাই অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার ক্রটিসমূহ দূর করা অপরিহার্য।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার মানে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করা। সংস্কারকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহের মধ্যে যেসব ক্রটি, অনিয়ম ও সংকট দেখা দিয়েছে- তা থেকে স্পষ্ট যে, বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও আস্থার ঘাটতি রয়েছে। ফলে সমাজের সকল স্তর থেকেই নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারকে স্বাগত জানিয়েছে।

এ গবেষণায় প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গবেষণার যথার্থতা, প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি ডেভিড ইষ্টনের সিস্টেম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। পুস্তক পর্যালোচনায় নির্বাচন ও নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষকের গ্রন্থের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এখানে গবেষণায় গৃহীত তিনটি অনুকল্প উপস্থাপন করা হয়েছে। সংস্কারের অভাবে নির্বাচনে কেমন বিরূপ প্রভাব পড়ে তা স্থান পেয়েছে। সকল বিষয় এ গবেষণায় উপস্থাপন করা হয়নি। শুধুমাত্র 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন' এর আলোকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা, নির্বাচন পদ্ধতি,

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সমস্যাবলী, সংস্কার আন্দোলন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা। দেখা যায় বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে সংকট, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। এখানে বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতি, নির্বাচন কমিশন এবং এর ভূমিকা, আইনি কাঠামো তুলে ধরা হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও শ্রীলংকার নির্বাচন পদ্ধতিও উপস্থাপন করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিটি দেশ নির্বাচন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য আমাদের দেশের মত একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং এ অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রায় একই রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর নির্বাচন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে কিছু পার্থক্য ছাড়া অনেক মিল পাওয়া যায়। অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবাই গুরুত্ব প্রদান করে।

তৃতীয় অধ্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৭২-১৯৯০) পর্যন্ত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচন স্থান পেয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী দেড় দশকে অনুষ্ঠিত সকল সংসদ নির্বাচন, নির্বাচনী ব্যবস্থা, ত্রুটি, ব্যর্থতা প্রতিফলিত হয়েছে। দেখা যায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর যতগুলো জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সবগুলো বৈধতার প্রশ্নে সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। নির্বাচনী দুর্নীতির ব্যাপকতা ও সহিংসতা জাতির আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেনি। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে চিত্র উঠে এসেছে, তা হতে বুঝা যায় নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরিতে সংস্কারের বিকল্প নেই।
গবেষণা কর্মের চতুর্থ অধ্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার ইতিহাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা একটি কার্যকর অন্তর্বর্তী সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হয়। এখানে তিন জোটের রূপরেখা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ধারণা, ১৯৯১ এর নির্বাচন, প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ থেকে ১২ জুন ১৯৯৬ এর নির্বাচন, ২০০১ সালের নির্বাচন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৬-২০০৮, ২০০৮ সালের নিবার্চন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে ২০১৪ সালের নিবার্চন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, এ নির্বাচনে ১৫৩টি আসনে বিনা ভোটে প্রার্থী নির্বাচিত হয়। যা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে জোরালো করে তোলে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করার প্রচেষ্টা থাকলেও তা বার বার বাধাগ্রস্ত হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশার প্রদীপ নিভে যায়। পরবর্তিতে আপিল বিভাগ ২০ নভেম্বর, ২০২৫খ্রি. নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তির রায় অসাংবিধানিক ও বাতিল ঘোষণা করে।

এ গবেষণায় পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থার সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুর্নীতির স্বরূপ, নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার, সামরিক-বেসামরিক আমলাদের প্রাধান্য, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নেতৃত্ব, নেতৃত্বের দূর্বলতা, আদর্শিক দোদুল্যমানতা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের অভাব, রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুর্নীতির যে চিত্র পাওয়া যায়, তা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার না হলে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। নির্বাচন ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা কমে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। সংস্কার হলে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো অধিকতর শক্তিশালী হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায়ে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নির্বাচন হতে হবে নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষ নির্বাচন বলতে পক্ষপাতহীন, শান্তিপূর্ণ, অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানকে বুঝায়। আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনগুলো বৈধতার প্রশ্নে সম্পূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হয়নি। তাই সচেতন প্রতিটি নাগরিকই দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এখানে গণতন্ত্রে নির্বাচন ব্যবস্থার গুরুত্ব, নিরপেক্ষ নির্বাচন, নির্বাচনী সংস্কার, প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে নির্বাচনের উপর প্রভাব, সংস্কার আন্দোলন, নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার প্রসঙ্গে এফপিটিপি ও পিআর পদ্ধতি, জাতীয় সংসদ নির্বাচন আইন, সংস্কার প্রস্তাব, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকা, উন্নয়ন সহযোগীদের অবস্থান, নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত সংস্কার প্রস্তাব আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে পরিচালিত আন্দোলন তৎপরতা উঠে এসেছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার হলে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী বিধি মেনে নিয়ন্ত্রিত আচরণ করবে। বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার আন্দোলনে দেশের সকল স্তরের মানুষ আজ একমত। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করলে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়মনীতি মেনে চলতে বাধ্য হবে, দলের আয়-ব্যয় সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। শুধু নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার করে এবং আচরণ বিধি তৈরি যথেষ্ট নয়, এ আচরণ বিধি যাতে কঠোরভাবে মেনে চলা হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ এবং দেশের সবার সহযোগিতা থাকতে হবে।

এ গবেষণায় সপ্তম অধ্যায়ে গবেষণার বিষয়ে বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ হয়েছে। এখানে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে নাগরিকগণের ভাবনা এবং সংস্কার প্রসঙ্গে তাঁদের মনোভাব ফুটে উঠেছে। জরিপে ৮৬% উত্তরদাতা মনে করেন

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় না। ৯৩% উত্তরদাতা মনে করেন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা যথাযথ নয়, তাদের মধ্যে ৬২% মনে করেন নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার প্রয়োজন। ৪৫% উত্তরদাতা মনে করেন নির্বাচন কমিশনের প্রতি মোটেও বিশ্বাস নেই। ৭৫% তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন। জরিপে অংশগ্রহণকারীগণ স্পষ্টভাবে নির্বাচনী সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। এ জরিপ হতে প্রমাণ হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার হলে নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হবে।

গবেষণা কর্মে বাংলাদেশের বিদ্যমান সংসদীয় নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারে রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির মনোভাব, কর্মতৎপরতা ও প্রস্তাবনা সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের নির্বাচন পদ্ধতির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। কারণ, ঐ সকল দেশেও নির্বাচন ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য আমাদের দেশের মতো একই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং এ অঞ্চলের দেশগুলোতে প্রায় একই রকম সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান। উদ্দেশ্য হলো অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার জন্যে বাংলাদেশে কি ধরনের সংস্কার আনা প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করা; জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরা; বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন (১৯৯১-২০১৪) সমূহের ত্রুটি ও সমস্যা সমূহ বিশ্লেষণ করা; বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রশ্নে রাজনৈতিক দল সমূহের প্রস্তাব, দাবি ও তৎপরতা তুলে ধরা; সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রস্তাবকে বিশ্লেষণ করা। প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত গবেষণা প্রশ্নের আলোকে বলতে চাই, সংস্কার আমরা লক্ষ্য করি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে এবং পরবর্তীতে ২০০৬-২০০৮ সালের দিকে তা আরো ব্যাপকতা লাভ করে। এ সময় ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রবর্তন জনমনে অনেক আস্থা তৈরি করে, আইনি কাঠামো সংস্কার করা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়, নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা সংস্কারের ফলে নির্বাচনী প্রচারণায় কিছু পরিবর্তন আসে।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশন বারবার আস্থার সংকটে পড়েছে। অন্যতম কারণ কমিশনের নিজস্ব অক্ষমতা, নির্বাচন কমিশন বেসামরিক প্রশাসনের উপর নির্ভরশীল, অনেক সময় নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও সংকট তৈরি হয়েছে। তারই প্রেক্ষাপটে নির্বাচনী অনিয়ম প্রতিরোধে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে বলতে চাই, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্য রাজনৈতিক দল অপরিহার্য। নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে তারা তাদের নীতি জনগণের সামনে তুলে ধরে। সাধারণ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল সরকার গঠন করে। অনেক সময় এক বা একাধিক দল জোট সরকার গঠন করে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্রচর্চার অভাব রয়েছে এবং তা যাচাই করার কোন কর্তৃপক্ষ নেই। নির্বাচন কমিশনেরও এমন কোন ক্ষমতা নেই। দল কিংবা প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় যাচাই করা খুবই কঠিন। নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে রাজনৈতিক সরকারের আন্তরিকতার কিছুটা অভাব দেখা যায়। তারপরও বাংলাদেশের বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারে রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি ও প্রস্তাবনা রয়েছে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল বিষয় এ গবেষণায় তুলে ধরা হয়নি। শুধুমাত্র 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন' এর আলোকে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা, নির্বাচন পদ্ধতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সমস্যাবলী ও সংস্কার আন্দোলন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য, বিশ্লেষেণ ও পর্যালোচনা করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া যায়। যা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। গবেষণায় ফুটে উঠেছে নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও এর কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। এ কারণে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা সীমিত। আবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ নয়। জাতীয় সংসদ নির্বাচনী আইন ও বিধি আধুনিক না হওয়ায় আচরণবিধি লঙ্ঘন হলেও

Dhaka University Institutional Repository

যথাযথভাবে জবাবদিহিতার আওতায় আসে না। যেমন- নির্বাচনে পোষ্টার ব্যবহার নিয়ে প্রচুর আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলো একে অপরকে বিশ্বাস করে না। ফলে দলগুলো অনাকাঙ্খিত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে। রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনেক অভাব পরিলক্ষিত হয়। দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন নিরপেক্ষ হচ্ছে না। নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে জনগণের মাঝে আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার হলে নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হবে। জনমনে আস্থা ফিরে আসবে। দেশে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চা বাড়বে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরো অধিকতর শক্তিশালী হবে। নির্বাচন ব্যবস্থার কাঠামোগত ও আইনগত সংস্কার হলে নির্বাচন কমিশন আরো অনেক শক্তিশালী হবে, ফলে রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী বিধি মেনে নিয়ন্ত্রিত আচরণ করবে।

গবেষণায় উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ় নয়। নির্বাচন বার বার প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। জনগণ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ চেয়ে আছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, আইনি কাঠামো, রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়ায় নির্বাচন ব্যবস্থা কাঙ্খিত মানদন্ডে পৌঁছতে পারেনি। তাই নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রসঙ্গটি আলোচনায় আসছে এবং তা অপরিহার্য। জনগণও নির্বাচন নিয়ে আর সংঘাত চায় না। স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সকল ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

“বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ” শীর্ষক গবেষণার আলোকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো যা নির্বাচন ব্যবস্থার কাঠামোগত উন্নয়ন করবে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো শক্তিশালী করবে এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সহায়ক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে এবং ঐক্যমতের ভিত্তিতে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে। নির্বাচনকালীন প্রশাসন পরিচালনা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকবে। নির্বাচন কমিশনকে একটি শক্তিশালী ও স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। নির্বাচন মানে শুধু ভোটের দিন ভোট দেয়া নয়। নির্বাচনের প্রস্তুতি, ভোট গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ, নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি সব মিলিয়েই নির্বাচন। নির্বাচনী আইনসমূহ পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী আইন প্রনয়ণের মাধ্যমে নির্বাচনী সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের চেষ্টা করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার রুটিন কার্যক্রমের বাইরেও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচনী বিধির সংস্কার করতে পারবে। জাতীয় স্বার্থে সবাইকে একমত হতে হবে। দেশে সুন্দর গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে আস্থা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশে সবাইকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। যথাযথ নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য সহজ সংখ্যাধিক্য পদ্ধতি ও সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি নিয়ে সমীক্ষা চালাতে হবে। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া, তাই সংস্কারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন। গবেষণায় স্পষ্ট হয় যে, নির্বাচন ব্যবস্থায় একাধিক কাঠামোগত ও রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের পথে অগ্রসর হলে বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আসবেই। আমি বিশ্বাস করি এ গবেষণা কর্মটি ভবিষ্যৎ গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী, নীতিনির্ধারক এবং সচেতন নাগরিকদের জন্য সহায়ক হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলী

Books

Adam, Seligman. (1993). *The Idea of Civil Socity*, New York, Free Press.

Ahamed, Emajuddin. Ed. (1980). *Bangladesh Politics*, Dhaka, Centre for Social Studies, Dhaka University.

Ahmed, Fakhruddin. (1998). *The Caretakers: A First Hand Account of Interim Government of Bangladesh 1990-91*, University Press.

Akther, Yeahia, Mohammad. (2019). Electoral Corruption in Bangladesh, Routledge.

Ali, Raisa. (1996). *Representative Democracy and Concept of Free and Fair Elections*, New Delhi, Deep and Deep Publications.

Almond, Gabriel A. and Sidney Verbal. (1965). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Boston, Little Brown.

Banerjea, S.N. (2016). *A Nation in Making*, Rupa Pablication.

Choudhury, Dilara. (1995). *Constitutional Development in Bangladesh Stresses and Strains*, University Press.

Chowdhury, G.W. (1963). *Democracy in Pakistan*, Social Sciences Research Committee, University of Dacca.

Dhal, Robert A. (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven, CT yale University Press.

Dhaka University Institutional Repository

Finer, S.E. (1962). *The Man on Horseback: The Role of The Military in Politics*, London, Pall Mall Press.

Hakim, M.A. (1993). *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum*, University Press.

Hungtington, S.P. (1981). *The Solder and the State: The Theory and Politics of Civil military relation*, Havard University Press.

Huntington, S.P. (1968). *Political Order in changing Societies*, New Haven: Yale University Press.

Huntington, S.P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twenty Century*, University of Oklahama Press.

Husain, Shwkat. Ara. (1981). *Politics and sociaty in Bengal 1921-1936: A legislative perspective*, Bangla Academy.

Jahan, Rounaq. (1972). *Pakistan: Failure in National Integration* New York, Columbia University Press.

Jahan, Rounaq. (1980). *Bangladesh Politics: Problebs and Issues*. University Press. Dhaka.

Karim, Waresul. (2004). *Election under a caretaker government - An empirical analysis of the October 2001 parliamentary election in Bangladesh*. The University Press.

Kaur, A. (2009). Electoral reforms in India : Problems and needs 1989-2009. Unistar Books, India.

Kumar, V. (2009). Electoral reforms in India: Current discourse. Rawat Publication, India.

Dhaka University Institutional Repository

Maniruzzaman, Talukdar. (1975). *Redical Politics and Emergence of Bangladesh*, Bangladesh books International.

Maniruzzaman, Talukdar. (1988). *Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka: University Press.

Mendis, D. (Eds). (2008). Electoral process and governance in South Asia. SAGE, India.

Muhith, A.M.A. (1978). *Bangladesh: Emergence of a Nation*, Dhaka University Press.

Palmer, Norman D. (1961). *The Indian Political System*, Boston, Houghton Mifflin Company.

Park, Richard L. and Wheeler, Richard S. (1954). *East Bengal Under Governonr Rule*, Far Eastern Survey, University of California Press.

Pye, L.W. (1972). *Aspect of Political Development*, New Delhi, Amerind Publishing.

Rahman, Zillur. (1984). *Martial Law of Martial Law, Leadership Crisis in Bangladesh*, Dhaka University Press.

Riaz, Ali. (1994). State Class & Military Rule: Political Economy of Martial Law in Bangladesh, Nadi New Press.

Schumpeter, Joseph. (1987). *Capitalism, Socialism and Democracy*, Union Paperbacks.

Seligman, Adam. (1993). *The Idea of Civil Society*, New York, Free Press.

Thiagraph, Jeevan. (1997). *Governance and Electoral Process in Bangladesh*, New Delhi, Vikas Publshing House.

Dhaka University Institutional Repository

Verba, Sidney. Nie, Norman H. Kim, Jae-on. (1978). *Political Participation and Political Equality; A Seven Nation Comparison*, Cambridge University Press.

Vundru, R. S. (2017). Ambedkar, Gandhi and Patel: The making of Indian's electoral system. Bloomsbury, India.

Weiner, Myron. (1967). *Party Building in a new Nation: The Indian National Congress*, Chicago, The University of Chicago Press.

আহমদ, আবুল. মনসুর. (১৯৭০). *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, (পঞ্চম সংস্করন), খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা।

আহমেদ, ফয়েজ. (২০০৮). *রাজনীতির গতিধারা*, অন্যান্য, ঢাকা।

আখতার, মুহাম্মদ. ইয়াহ্ইয়া. (১৯৯১). *দুর্নীতির স্বরূপ অন্বেষণ ঃ বাংলাদেশ*, নিবেদন প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন।

আহমদ, মওদুদ. (২০০০). *গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস।

আমিন, নেসার. (সম্পাদিত). *বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও ফলাফল*, ঐতিহ্য।

আহমেদ, কামাল. উদ্দিন. (১৯৯২). চুয়ান্ন সালের নির্বাচন : স্বায়ত্ব শাসন ১৭০৮-১৯৭১ *এশিয়াটিক সোসাইটি।*

ইসলাম, সৈয়দ. সিরাজুল. (সম্পাদিত). (১৯৯৩). *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, প্রথম খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ।

উমর, বদরুদ্দীন. (২০০৯). *সামরিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বাংলাদেশ*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

কায়সার, আশরাফ. (১৯৯৮). *বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকান্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

খান, মিজানুর রহমান. (২০০৩). *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ*. শুভ প্রকাশন, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

চক্রবর্তী, দেবাশিষ. (১৯৯৪). *রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তত্ত্ব ও প্রতিষ্ঠান*, সেন্ট্রাল এডুকেশন্যাল এন্টার প্রাইজ, কলকাতা।

জগলুল, আল. (১৯৯০). *বাংলাদেশ বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৪৮-৮৯*. প্রতীক প্রকাশনা, ঢাকা।

ঠাকুর, আবদুল. হান্নান. (১৯৯৮). *নির্বাচন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

পাটওয়ারী, আয়াত আলী. (২০১০). *সাংবিধানিক সরকার বনাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার*. আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

ফ্রিডম্যান, মিল্টন. (২০০৩). *নির্বচনের স্বাধীনতাঃ একটি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা*. ফখরুদ্দিন, এ. ইউ. এম. (অনুদিত). বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ফখরুল চৌধুরী সম্পাদিত, *সিভিল সোসাইটি তত্ত্ব প্রয়োগ ও বিচার*. কথা প্রকাশ

তালুকদার, মাহবুব. (২০২৩). *নির্বাচননামা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

মনিরুজ্জামান, তালুকদার. (২০০৩). *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ*, শুভ প্রকাশন, ঢাকা।

মান্নান, আব্দুল. (২০০৫). *ইলেকশনস্ অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ*, একাডেমিক প্রেস অ্যান্ড পাবলিসার্স লাইব্রেরী, ঢাকা।

মজুমদার, বদিউল আলম. (২০০৯). *গণতন্ত্র, নির্বাচন ও সুশাসন*. আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মজুমদার, ড. এম আবুল কাশেম এবং ইসলাম, মুহাম্মদ মুজাহিদুল, *ভুটানের নির্বাচন কমিশন: নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের অধীনে অভিনব নির্বাচন*. কলিমউল্লাহ, ড. নাজমুল. আহসান ও চৌধুরী, ড. সাবের আহমেদ. (সম্পাদিত). দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্র নির্বাচন এবং নির্বাচন কমিশন, শিল্পৈষী, ঢাকা।

মহাপাত্র, অনাদিকুমার. (২০১১). *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলকাতা।

মামুন, মুনতাসির ও রায়, জয়ন্তকুমার. (১৯৯৫). *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, অবসর প্রকাশনী. ঢাকা।

রহমান, এম. হাবিবুর. (২০১৩). *নির্বাচন যথেষ্ঠ নয়, তবে নির্বাচন হতে হবে*. শুদ্ধস্বর, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

রশিদ, হারুন. অর. (২০০৩). *বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিত্বমুলক সরকারের ক্রমবিকাশ (১৮৬১-২০০১)*, হাসিনা প্রকাশন।

রহমান, সিরাজুর. (২০০২). *ইতিহাস কথা কয় ও নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ*, শিকড়।

রহমান, দিলারা ও হক, মোঃ আসিরুল. *সিভিল সোসাইটি ও বাংলাদেশ*, তারেক শামসুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক।

রহমান, ড. আতাউর, *নাগরিক সমাজ ও সুশাসন*, ফকরুল চৌধুরী সম্পাদিত. (২০০৮). সিভিল সোসাইটি তত্ত্ব, প্রয়োগ ও বিচার. কথা প্রকাশ. ঢাকা।

শফিক, মাহমুদ. (১৯৯৬). *জনগণ সংবিধান নির্বাচন*, অন্যান্য, ঢাকা।

হক, ড. আবুল. ফজল. (১৯৯০). *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হাসান, সোহরাব. (২০০৭). *নির্বাচন গণতন্ত্র মানবাধিকার : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া*, দীপ্ত প্রকাশনী ঢাকা।

হোসেন, এস. আনোয়ার. (২০০৬). *বাংলাদেশ রাষ্ট্র, রাজনীতি, গণতন্ত্র ও সুশাসন*. একুশে বাংলা প্রকাশন, ঢাকা।

হোসেন, এম. সাখাওয়াত. (২০১৪). *বাংলাদেশে নির্বাচনী সংস্কার ১৯৭২-২০০৮*, চৌধুরী, রামেন্দ (অনুদিত). প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

হোসেন, এম. সাখাওয়াত. (২০১৪). *বাংলাদেশে নির্বাচনী সংস্কার ১৯৭২-২০০৮*, চৌধুরী, রামেন্দ্র (অনুদিত). প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার. *গণতন্ত্র ও সিভিল সমাজ চাওয়া পাওয়ার হিসাব*, অরুপরাহী সম্পাদিত, সিভিল সোসাইটি রাজনৈতিক পর্যালোচনা, লোকজ, ঢাকা।

হুদা, এটিএম শামসুল. (২০১৪). *ফিরে দেখা জীবন*, প্রথমা প্রকাশন।

Articles

Banu, UAB Razia Akter. (1981). The Fall of Sheikh Mujib Regime An Analysis. *The IndianPolitical Science Review***.** Vol – *XV*, N0-1 Januaryn1981 P-9

Hariharan, A. India, A Common Goal: Get Rich Quick" *Far Eastern Economics Review* 85,35 6th September, 1974 c„t 25

Hossain, Mohammad. Sohrab. (2008). Ninth Jatiya Sangsad Election 2008 and Win of Awami League: An Assessment, *Bangladesh Political Science Review*, Vol-*6*, No-1 , p. 105-118

Maniruzzaman, Talukder. (1992). The Fall of the Military Dictator: 1991 Elections and the Prospect of Civilian Rule in Bangladesh, *Journal of Pacific Affairs*, Vol-*65*, No-2, Summer

Salman, L.M and Anheir, H.K. (1998). *Socity Origins of Civil socity: Explaining the Non Profit Sector Cross Nationality Volustirs*. Vol-*9*. p. 213-248

Dhaka University Institutional Repository

Reports and Documents

The Constitution of The Kingdom of Bhutan, 2008

https://bn.wikipedia.org/wiki

The CCHRB Election Observation report: The Eight Parliamentary Election 2001.

BBC NEWS বাংলা,

https://sarbojonkotha.info/wpcontent/uploads/2020/03/sk-20-varoter-nirbachon.pdf

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা, ২০১৬ সালের এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত

বাংলাপিডিয়া

বাংলাদেশ গেজেট, আর পিও, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০০৯

রায়, অরুন্ধতী. (২০১৯). ভারতের নির্বাচন নিয়ে অরুন্ধতী রায়ের সংঙ্গে সংলাপ, *সর্বজনকথা*, আগস্ট-অক্টোবর,২০১৯

https://sarbojonkotha.info/wpcontent/uploads/2020/03/sk-20-varoter-nirbachon.pdf

https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article2044036.bdnews

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইট (২৬-৫-২০২৫খ্রি. পর্যন্ত),

https://www.ecs.gov.bd/page/national-parliament-election-lawবাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এর ওয়েবসাইট, https://jamaat-e-islami.org/article-details.php?category=80&article=2466)

Dhaka University Institutional Repository

Newspapers and Periodicals

দৈনিক ইত্তফাক

দৈনিক ইনকিলাব

দৈনিক যায়যায় দিন

দৈনিক প্রথম আলো

যুগান্তর

দৈনিক জনকণ্ঠ

কালবেলা

দৈনিক ভোরের কাগজ

দৈনিক সমকাল

নয়া দিগন্ত

https://www.dailynayadiganta.com/subcontinent/837844

সাপ্তাহিক রোববার

সাপ্তাহিক বিচিত্রা

Holiday

আমার বার্তা অনলাইন

https://amarbarta.com/national/42292

সাপ্তাহিক ২০০০

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট

বি এস এস নিইজ, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

Unpublished Research Works

Hossain, Mohammad Sohrab, (2010). *Role of Opposition in Democratic Politics: A Study with Special Reference to Bangladesh Jatiya Sangsad (1991-2006),* Ph.D. Thesis, Dhaka University.

আলম, মুহাম্মদ জহিরুল. (২০১১). *বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলন ঃ রাজনৈতিক দল ও সিভিল সোসাইটির ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা*. এম.ফিল. থিসিসি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

"বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার : একটি বিশ্লেষণ"
শীর্ষক গবেষণার প্রশ্নমালা

প্রথম অংশঃ সাধারণ তথ্য

নাম	
পদবী	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
ঠিকানা	
মোবাইল নম্বর	
ই মেইল	
বয়স	
লিঙ্গ	

দ্বিতীয় অংশঃ গবেষণার প্রশ্নমালা

প্রশ্ন ০১	আপনি কি মনে করেন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়? √ চিহ্ন দিন। (ক) হ্যাঁ (খ) না (গ) মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই
প্রশ্ন ০২	আপনি কি মনে করেন, বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থা যথাযথ? √ চিহ্ন দিন। হ্যাঁ [ ] না [ ] না হলে আপনার মন্তব্য কী? (ক) নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার প্রয়োজন (খ) নির্বাচনী আইনগুলো যথাযথ প্রয়োগ হলেই চলবে (গ) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন ০৩	বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন ব্যবস্থার কোন দিকটি আপনার মতে সবচেয়ে বেশি সংস্কারের প্রয়োজন? √ চিহ্ন দিন। (ক) নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা (খ) ভোটারদের নিরাপত্তা (গ) নির্বাচনে কালো টাকার ব্যবহার
প্রশ্ন ০৪	আপনি কি মনে করেন নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ রয়েছে? √ চিহ্ন দিন। (ক) হ্যাঁ (খ) না (গ) মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই
প্রশ্ন ০৫	নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সম্পর্কে আপনার বিশ্বাসের মাত্রা কতটা? √ চিহ্ন দিন। (ক) সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য (খ) কিছুটা বিশ্বাসযোগ্য (গ) মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নই
প্রশ্ন ০৬	সুষ্ঠু নির্বাচনে প্রার্থীদের আর্থিক স্বচ্ছতার বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ? √ চিহ্ন দিন। (ক) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (খ) কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ (গ) গুরুত্বপূর্ণ নয় (ঘ) মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই
প্রশ্ন ০৭	নির্বাচনে অবৈধ অর্থের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ? √ চিহ্ন দিন। (ক) নিবেদিত প্রাণ রাজনীতিবিদগণ কালো টাকার কাছে পরাজিত হচ্ছেন (খ) নির্বাচনে কোন অবৈধ অর্থ ব্যয় করা হয় না (গ) নির্বাচনে অবৈধ ব্যয় রোধে রাজনৈতিক দলগুলো আন্তরিক নয়
প্রশ্ন ০৮	নির্বাচনে পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ? √ চিহ্ন দিন। (ক) প্রশাসনের সহযোগিতায় পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয় (খ) প্রশাসনিক ও আইনের দুর্বলতাকে ব্যবহার করে পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয় (গ) পেশিশক্তি ও অস্ত্রের ব্যবহার হয় না
প্রশ্ন ০৯	রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কতটা স্বচ্ছ ভূমিকা রাখে বলে আপনি মনে করেন? √ চিহ্ন দিন। (ক) সম্পূর্ণ স্বচ্ছ

Dhaka University Institutional Repository

	(খ) কিছুটা স্বচ্ছ (গ) মোটেও স্বচ্ছ নয় (ঘ) মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই
প্রশ্ন ১০	নির্বাচনী দুর্নীতির প্রভাব কোথায় পড়ে বলে আপনি মনে করেন? √ চিহ্ন দিন। (ক) রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে (খ) শুধুমাত্র নির্বাচন ব্যবস্থার উপর (গ) সংখ্যালঘুদের উপর (ঘ) শাসন ব্যবস্থার উপর
প্রশ্ন ১১	আপনি কি মনে করেন নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন করা উচিত? √ চিহ্ন দিন। (ক) হ্যাঁ (খ) কিছুটা কঠোর আইন করা উচিত (গ) না
প্রশ্ন ১২	ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটদানের পরিবেশ নিশ্চিত করতে কোন বিষয়টি জরুরী? √ চিহ্ন দিন। (ক) পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকা (খ) নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা (গ) ভোটারদের সাহসী মনোভাব
প্রশ্ন ১৩	আপনি কি মনে করেন আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি বাংলাদেশের জন্য কার্যকর হবে? √ চিহ্ন দিন। (ক) হ্যাঁ (খ) না (গ) মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই
প্রশ্ন ১৪	আপনি কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সমর্থন করেন? √ চিহ্ন দিন। (ক) হ্যাঁ (খ) না (গ) মন্তব্য করতে ইচ্ছুক নই
প্রশ্ন ১৫	নির্বাচনী সংস্কারের জন্য সবচেয়ে জরুরী পদক্ষেপ কোনটি বলে আপনি মনে করেন? √ চিহ্ন দিন। (ক) শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন

Dhaka University Institutional Repository

	(খ) নির্বাচন আইন সংস্কার (গ) রাজনৈতিক সদিচ্ছা
প্রশ্ন ১৬	নির্বাচন কমিশনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য কোন ধরনের সংস্কার প্রয়োজন? √ চিহ্ন দিন। (ক) নির্বাচন কমিশনের আর্থিক ও প্রশাসনিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি (খ) রিটার্নিং অফিসারের নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিবর্তন (গ) নির্বাচন কমিশনের কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা
প্রশ্ন ১৭	আপনার মতে নির্বাচনী আইন লংঘনের জন্য শাস্তির বিধান কি থাকা উচিত ? √ চিহ্ন দিন। (ক) কারাদন্ড (খ) অর্থদন্ড (গ) নির্বাচনে অযোগ্যতা
প্রশ্ন ১৮	আপনি কি মনে করেন বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় নারী ও সংখ্যালঘুদের অংশগ্রহণের সুযোগ যথেষ্ট? √ চিহ্ন দিন। (ক) হ্যাঁ যথেষ্ট (খ) কিছুটা যথেষ্ট (গ) যথেষ্ট নয়
প্রশ্ন ১৯	জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং (EVM) ব্যবহার কতটা গ্রহণযোগ্য? √ চিহ্ন দিন। (ক) সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য (খ) নির্দিষ্ট কিছু কেন্দ্রে গ্রহণযোগ্য (গ) গ্রহণযোগ্য নয়
প্রশ্ন ২০	নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার প্রক্রিয়া কিভাবে আরো স্বচ্ছ করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন? √ চিহ্ন দিন। (ক) ফলাফল ঘোষণার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা (খ) আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক দ্বারা মনিটরিং করা (গ) ভোট গণনার প্রক্রিয়া সরাসরি সম্প্রচার করা (ঘ) অন্যান্য (বিশেষভাবে উল্লেখ করুন)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

স্থির চিত্রে নির্বাচনী অনিয়ম, যা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কারের দাবি তোলে

 চিত্র: নির্বাচন কেন্দ্রিক সহিংসতা উৎস: https://www.dw.com/bn/অবৈধ-সরকারের-অবৈধ-মন্ত্রিসভা/a-17356952	 চিত্র: কেন্দ্রের সব ব্যালট বাক্স ছিনতাই উৎস: **https://www.jagonews24.com/country/news/913997**
 চিত্র: ছিনিয়ে নেয়া ব্যালট বাক্স মিলল পুকুরে উৎস: **https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/election/news-583766**	 চিত্র: ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে আগুন উৎস: **https://www.somoynews.tv/news/2024-01-07/I0JHXsRu**
 চিত্র: নির্বাচনী সহিংসতা উৎস: **https://www.bbc.com/bengali/articles/c973ldzq4gdo**	 চিত্র: ভোটার শূণ্য কেন্দ্র উৎস: **https://www.bbc.com/bengali/articles/c9vk4n1mwkeo**

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৫

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৭ ভাদ্র, ১৪৩২/০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

নং ১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০০৬.২৫-৬৫০।—জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে "জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৫" সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হইতে স্মারক নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০০৬.২৫-১৫২ মূলে ২৪ জুন, ২০২৫ তারিখে জারিকৃত এবং জুন ২৬, ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে নিম্নরূপ সংশোধনী আনয়ন করা হইল:

"গেজেটের ৬৪৭০ নং পৃষ্ঠার ৩(১) এর "ভোটার অনুসারে কেন্দ্র ও কক্ষ স্থাপন: গড়ে ৩০০০ (তিন হাজার) ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র এবং গড়ে ৫০০ (পাঁচশত) জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৪০০ (চারশত) জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে কক্ষ নির্ধারণ করতে হবে।" এর স্থলে "ভোটার অনুসারে কেন্দ্র ও কক্ষ স্থাপন: সাধারণভাবে ৩০০০ (তিন হাজার) ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র এবং সাধারণভাবে ৬০০ (ছয়শত) জন পুরুষ ভোটারের জন্য ও ৫০০ (পাঁচশত) জন মহিলা ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে।" সংখ্যা ও শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।"

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ মাহবুব আলম শাহ্
উপসচিব (নিঃসঃওসঃ)।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

(৮৮৩১)

মূল্য : টাকা ৪.০০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

সকল কমিটিতে ৩৩ শতাংশ মহিলা অন্তর্ভুক্তি

অতীব জরুরী
বিশেষ বাহক মারফত

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, প্লট-ই, ১৪-এ, আগারগাঁও, ঢাকা
www.ecs.gov.bd

নির্বাচন সহায়তা-১ শাখা

নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.৫০.০০৯.১৫-১৫৪(৪০) তারিখ : ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ / ১৩ জুন, ২০১৭

বিষয় : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর Article 90B(1)(b)(ii) অনুযায়ী নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩% মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ।

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর Article 90B(1)(b)(ii) নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

"90B.(1) If any political party desires to be registered, it shall-

(a) fulfill one of the following conditions, namely-

(i) secured at least one seat with its electoral symbol in any parliamentary election held since the independence of Bangladesh; or

(ii) secured five percent of total votes cast in the constituencies in which its candidates took part in any of the aforesaid parliamentary elections; or

(iii) established a functional central office, by whatever name it may be called with a central committee, functional district offices in at least in one-third administrative districts, offices in at least one hundred Upazilas or Metropolitan Thana having a minimum number of two hundred voters as its members in each of them; and

(b) In addition to comply with the terms and conditions referred to in sub-clause(a), political party, disiring to be registered with the commission, shall have the following specific provisions in its constitution, namely-

(i) to elect the members of the committees at all levels including members of the central committee;

(ii) **to fix the goal of reserving at least 33% of all committee positions for women including the central committee and successively achieving this goal by the year 2020;**

...."

০২। উক্ত বিধান অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল পর্যায়ের কমিটিতে ৩৩% মহিলা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে এ পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে আগামী ১০ জুলাই, ২০১৭ তারিখের মধ্যে অবহিত করার জন্য নির্দেশিতক্রমে অনুরোধ করা হল।

আপনার বিশ্বস্ত
(মোঃ আবুল [illegible])
উপসচিব (নিবন্ধন)

প্রাপক : ....
....
....

D:\Kamrul\Letter\Party Registration.doc